ভবানীপ্রসাদ বসুকে

লেখিকার অন্যান্য রচনা :

হংসবলাকা (ছোট গল্প)

তবু প্রেম, তবু প্রাণ (কবিতা)

ক্রুশ ও শতদল (উপন্যাস)

রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের কথাই বলব এই স্মৃতিচারণে। তার মধ্যে আমার নিজের এবং অন্য কথাও এসে যাবে আগে। অবশ্য ঠিক্ সেই দিনটিই হুবহু প্রতিলিপি বা ফোটোগ্রাফ দিতে পারব না। মন তা দেয় না, নির্বাচন করে সে কোনটাকে বড়ো করে তোলে, কোনটা হয় বিস্মৃত। বস্তুর নির্যাসমাত্র এ্যাব্স্ট্রাকট শিল্পছবিও হতে পারে না কোনো স্মৃতিচারণ। মানুষ, ঘটনা, সময়, সত্যের প্রতি সৎ থাকতে চেষ্টা করব। তবু বলে নিই, স্মৃতি অনেক সময়ই জল অতলের অবগাহনে স্নান সেরে সিক্ত হয়ে আসে। রঙটা রঙ না থেকে হয়ে যায় জলরঙের।

খুশি হবো, আমার এই স্মৃতিচারণ যদি এসে যায় পর্দাশিল্পের স্বল্প কাছাকাছি, যে সিনেমা মাত্র পণ্য তা নয়, যে সিনেমা শিল্প। এবং শিল্প মাত্রই জীবনকে চিহ্নিত এবং পরিচিত করতে সাহায্য করে। অবশ্য পুরোপুরি এই পদ্ধতিরও আমি পক্ষপাতী নই। লরেন্স অব এ্যারেবিয়া ছবিটির সেই অংশ স্মরণ করা যাক্; দিগন্তজোড়া ধূ ধূ হলুদ বালুরাশিতে ছোট্ট কৃষ্ণসচল বিন্দুটি যার দিকে চেয়ে Seven Pillars of Wisdom এর লেখক, যিনি ব্যবহৃত হলেন ব্রিটেন এবং আরব উভয়েরি হাতে, যেহেতু স্বদেশ এবং প্রবাস-বিদেশ উভয়ের প্রতিই ছিল তাঁর প্রীতি; সেই অপূর্ব মানুষ লরেন্স আর তাঁর সঙ্গী আরবটি বিভ্রান্ত—আমাদের নিঃশ্বাস রোধ করিয়ে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। নিশ্চিত জীবনের একটি দিক্কে উন্মোচিত করে। কিন্তু, আর্জেন্টিনার লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো যখন তাঁর মূল্যায়নে বলেন: "মানব সমস্যা আর বিশ্বরহস্য বিষয়ে প্রায় যেন কোনো ধর্মীয় উপলব্ধি।" মাত্র কয়েকটি শব্দের সম্মেলন আমাদের নিয়ে যায় শব্দগুলি থেকে অনেক দূরে, অনেক গভীরে।

আমার স্মৃতিচারণের দিনগুলি পাঠক-পাঠিকার চিত্তে উজ্জ্বল ছবিতে ধরা পড়ুক। আমার যতখানি এই ইচ্ছা, তাদের অন্তর্জগতে প্রবেশ করে গভীর হোক, সে ইচ্ছাও কম নয়। জীবনের অনুভবী মুহূর্তগুলি গভীরে প্রবেশ করুক।

আংগিকের দিক থেকে বলবার; আমি কয়েকটি উক্তির বারবার আবর্তন ঘটিয়েছি। যেমন, কোনদিনই ফেরানো যায় না। আবার সব দিনই স্মরণের স্মৃতিতে জীবনযাপনের বর্তমানে। ভবিষ্যতের শুভ আকাঙ্ক্ষায়। যেমন একটি উক্তি : যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব। চেয়েছি কাব্য আর গদ্যের গাঁটছড়া বন্ধন, উক্ত এবং অনুক্তের। কতখানি সক্ষম হয়েছি জানিনে।

আমি ঋণী প্রভাতদা, বিষ্ণু দে, আবুসয়ীদ আইয়ুব, শান্তিদা শঙ্খ ঘোষ এবং সার্ত্রয়ের বদল্যার আলোচনায়।

* * *

কোনোদিনই ফেরানো যায় না
এমনকি কালকের দিনটিকেও নয়
তবু মানুষের জীবন : স্মরণ, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে।

"Time present and time past
Are both perhaps in time future
And time future contained in time past"
(T. S. Elliot)

কোনোদিনই ফেরানো যায় না
সময়ের অবিরাম স্রোত বহমান অবিরাম
ভেসে চলে দিনগুলি, রাতগুলি
এক একটি ক্বচিৎ কখনো সংগ্রামী মাথা তুলে
জেগে ওঠা চর।

সব দিন খসে : অসংখ্য দিনজালে
সব দিন ঝরে : বিস্তৃতপথ ধূলায়

কোনদিন তার জাল থেকে ছিট্‌কিয়ে
ধূলোর আড়াল ঠেলে ঝলকিয়ে দেখা দেয়।
রঙ, রেখা, গন্ধ, শব্দ, সুর, স্বরধ্বনি
ঠিক সেদিনের মতো নয়। কেননা জীবন
সময় অতীত, সময় বর্তমান, সময় ভবিষ্যৎ।
জানি ফেরাতে পারবো না ঠিক সেই দিনটিকে
স্রোতে নেচে নেচে নুড়ি হয়েছে গোল। প্রৌঢ়তায় প্রাজ্ঞ
অনেক কৌণিক খাঁজ খসে গেছে।
তবু মন : পাহারায় বসে থাকে
জাল থেকে ছিটকোনো, ধূলোর আড়াল ঠেলা দিনগুলো
স্মরণের কৌটায় ভরে।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছি ছায়া প্রেক্ষাগৃহে। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর, বাংলার ভাদ্রমাস চলছে। কয়েকদিন আগেই কুন্তলা-মাসিমা খবর দিলেন : কবি আসছেন।

কুন্তলামাসিমা থাকতেন তিন নম্বর ভবানী দত্ত লেনে। ওয়াই, এম, সি, এর পাশ দিয়ে চলে গেছে যে রাস্তা। সেকেলে পুরনো ধাঁচের মস্ত বাড়ী, চকমেলানো, লালরঙের দালান। কাঠের জাফরির খাঁজে খাঁজে বক্‌বকম্ করছে পায়রারা। কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে যাদের বলেছেন গৃহবলিভুজামাকুলা, সেই গৃহবলিভুক্। বৃহৎ যৌথ পরিবারে তারাও পরিবারভুক্ত।

অত বড় পরিবারের দায়দায়িত্ব সেরেও কাব্যরসচর্চার শখ রেখেছিলেন বাঁচিয়ে। সেই সূত্রেই জেনারেশান গ্যাপের বেড়ার বাধা ঠেলে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হয়তো আমাদের সেইকালে জেনারেশান গ্যাপের বাধাটাও এমন প্রবল ছিল না। রুচির মিলে, রসবোধের মিলে আমরা ছোটবড়োরা একত্র হতে পারতাম। আর রবীন্দ্রনাথও আমাদের তিনপুরুষকে একাই রেখেছিলেন মাতিয়ে। কুন্তলামাসিমা আমার আত্মীয়া ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন আত্মীয়ের অধিক। আমাকে কী ভালোই না বাসতেন। আমার গান, আমার লেখা যেন তাঁর কন্যারই গান, লেখা। মনে পড়ে, গান শুনতে তিনি কখনো ভালোবাসতেন না চার দেয়ালের ঘরে। বরাবর আমাকে টেনে নিয়ে যেতেন ছাদে। ঝকঝকে তারা ভরা রাতে, রুপোলি চাঁদের আলোয় কিংবা মেঘের লুকোচুরি খেলায় ছাদেই শুনতেন গান। সেদিনের সেই মহিলা-জগতে খোলা আকাশতলে একখানা ছাদ তাই বড়ো জরুরী ছিল।

বাবাকে ধরে বসেছি, যেমন করেই হোক্, জোগাড় করতেই হবে

২

টিকিট। বালীগঞ্জের রাসবিহারী এভিনিউ থেকে চলেছি আপার সার্কুলার রোডে ছায়া প্রেক্ষাগৃহে। আজকের দিনে এটা কোথাও যাওয়াই নয়। কিন্তু সেদিনে আমার সমস্ত হৃদয় যেন একদিগন্তে পাড়ি দিয়ে আর একদিগন্তে পৌঁছবার জন্য উৎসুক। শুধু বর্ষামঙ্গল নয়, দেখতে চলেছি রবীন্দ্রনাথ। কুন্তলামাসিমা জানিয়েছেন, মঞ্চেই উপবিষ্ট থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জায় ওইটিই নাকি রেওয়াজ।

গেছি মা, বাবা, আমি। ওদিক থেকে কুন্তলামাসিমারাও এসেছেন বেশ একটা দল বেঁধে। তাঁর ছোটো জা সংগে এনেছেন দূরবীণ। আমাদেরো ভাগ দিলেন। আরো অনেকে এনেছিলেন সংগে। দূরবীণ কষে কষে সেদিন অনেকেই দেখেছিলেন কবিকে।

প্রথম সেই দেখা। বুকের দ্রুত আলোড়ন, "দুরু দুরু করে মোর বক্ষ", প্রথম বর্ষামংগল, গান, নাচ, আলো, সেতার, এস্রাজ, পাখোয়াজ, বেহালা, মৃদংগ, মন্দিরা—প্রথম সেই মুগ্ধতা, আজো স্মরণে আছে তার আলোড়ন।

আর কোথাও নয়—এই কলকাতা শহরেই ট্রামবাসমুখরিত জনারণ্যেই সেই সন্ধ্যায় নামলো রূপকথার পরীলোক। ছায়া প্রেক্ষাগৃহের দুয়ারগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেল। নামলো অন্ধকার। সেই বন্ধদুয়ার ঘরে অন্ধকারে, সকলের কথা জানিনে, আমি গেলাম হারিয়ে। মঞ্চ আলো করে কেদারায় বসেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ওই মুখচ্ছবির বর্ণনা আমি দিতে পারব না। আমার বারবার মনে হয়েছে, ফোটো অসঙ্গতিময় আচরণ করেছে রবীন্দ্রনাথের ওপর। রবীন্দ্র উক্তির অনুসারী হয়েই বলি, হীরের ভাবটাকে ধরেছে, কিছুটা আকারও, আলোটাকে ধরতে পারেনি। যাঁরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ফোটো দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখেননি, দেখার দিক থেকে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনেকটাই দেখেননি।

রবীন্দ্রনাথের আশেপাশে পায়ের কাছে বসেছে গানের দল, পিছনে সার বেঁধে বাজিয়েরা। সামনের বেশ কিছুটা অংশ খালি

আছে নাচের জন্য। সব গানেই নাচ হয়নি। সব গানও আজ মনে নেই। গানগুলির মধ্যে এখনো যা বিশেষ মনে পড়ে—

১। গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা॥

২। আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নাম্‌ল, বৃষ্টি নাম্‌ল, তিমির নিবিড় রাতে।

৩। আমি শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জলছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে।

৪। এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।

সেদিন জানতাম না, পরে জেনেছি সেদিনের গানের দলে, পদতলে-বসা অমিয়া ঠাকুর। শান্তিনিকেতনছাত্রীদের সংগে মিলিয়ে ছিলেন অশান্তিনিকেতনী উমা বসু (হাসি)। দিলীপ রায়ের প্রিয় শিষ্যা অতি অল্পবয়সেই যার জীবনদীপ নিভে গিয়ে বাঙলার গানের জগতে একটি ফাঁকের সৃষ্টি করে গেল। বোধকরি, গীতশ্রী ইভা আর আর মন্দিরা দেবীও ছিলেন।

নেচেছিলেন মণিকা দেশাই। প্রেক্ষাগৃহে ফিস্‌ফাস্‌ চলেছিল নিশ্চয় লীলা দেশাইয়ের বোন। স্টার-মুগ্ধতা আমাদের কালেই শুরু হয়েছিল। আর মনে আছে নেচেছিলেন—শ্রীমতী ঠাকুর। আমেদাবাদের বিশিষ্ট পরিবার হাতীসিং, সেই বাড়ীর মেয়ে শ্রীমতী ছিলেন শান্তিনিকেতনছাত্রী। সৌমেন ঠাকুরের সংগে বিবাহান্তে শ্রীমতী ঠাকুর।

ঠিক মনে আনতে পারছিনে, তবু যতদূর মনে পড়ছে—সেতারের গৎভাঙাগান, ডা ডারাডিরির ছন্দে রচিত এসো শ্যামল সুন্দর, এই গানটির সংগেই নেচেছিলেন শ্রীমতী ঠাকুর। সেদিনকার নাচে ভাবাভিনয়ের সংগে মুদ্রাভিনয় এবং তালনৃত্যও ছিলো। স্থায়ী ও অন্তরা দুটি অংশের নাচ হয়ে যাবার পর সঞ্চারীর আগেই সুরু

মৃদংগের বোল এবং তালনৃত্য। তালনৃত্য হয়ে যাবার পর ফের সঞ্চারী ও আভোগের নাচে গানের সংগে হাতের মুদ্রা, পদক্ষেপভংগী এবং মুখের ভাবাভিনয়। এই পর্যন্ত স্মরণীয় মুগ্ধতা।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি সেই উক্তিটি ঃ—

"কবিতা যা শুধু স্মরণে থাকে তাই নয়, অবিস্মরণীয় যাহা"।

চেষ্টা করেও ভুলতে পারব না রবীন্দ্রকণ্ঠে প্রথম শোনা আবৃত্তি। জীবনের শেষদিনেও অবিস্মরণীয়। আবৃত্তির কবিতাটি ছিল "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থের "ঝুলন"। প্রথমে ধীরে ধীরে সুরু হলো, যেন মুদিত কলিকা ধীরে মেললো তার একটি, দুটি পাপড়ি। তারপর পাপড়ি মেলতে লাগলো স্তবকের পর স্তবকে ঃ অস্ফুট থেকে স্ফুট, স্ফুটতর পূর্ণপ্রস্ফুটিত কবি। ফুলটি সম্পূর্ণ মেলে ধরলো আপনাকে।

আমি, পরাণের সাথে খেলিব আজিকে,
মরণ খেলা, নিশীথ বেলা।

অনেক যত্নে, অনেক মাধুরী মণ্ডিত করে দেখা গেল সম্পূর্ণতা হলো না পাওয়া ঃ

হায় এতকাল আমি রেখেছিনু তারে, যতনভরে, শয়নপরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে—

সে যে জীবন অভিজ্ঞতার বাইরে জীবনবিচ্ছিন্ন, তাই

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্তপরাণ, আলসরসে, আবেশবসে।

তাই স্থির করতে হলো মরণ খেলা ঃ

তাই, ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে, নূতন খেলা, রাত্রিবেলা
মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া মারিবে ঠেলা
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলনখেলা, নিশীথবেলা ॥
দে দোল্ দোল্, দে দোল্ দোল্
এ মহা সাগরে তুফান তোল
বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল…

কণ্ঠ পাল্লা দিয়ে চলেছে ঝঞ্ঝায়, সাগরে এই শব্দগুলিতে। কানে শুনেছি গুরু গুরু মহাসমুদ্র গর্জন তখন।

মনে আছে সেই কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে শান্তিদেব ঘোষের বলিষ্ঠ পুরুষালি নাচ। যতদূর মনে পড়ে রক্তবর্ণ ধুতি পরনে, ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত। একটি উত্তরীয় পাট করে বাঁ কাঁধ বেয়ে নেমে এসে ডানদিকে বঙ্কিত।

*　　　　*　　　　*

বিদেহী আর অনামা প্রণাম রবীন্দ্রনাথকে মনে মনে করেছি কতবার, যখনি পড়েছি তাঁর বই, গেয়েছি তাঁর গান। প্রথম-দর্শন-আলোড়নে একটা কাজ করে বসলাম হঠাৎ। ছেলেমানুষী কবিতায় ভরা কবিতার খাতা পাঠিয়ে পাঠালাম, স্বাক্ষর প্রণাম ঃ

গুরুদেব,
আমি এসেছিনু দূর হ'তে ধেয়ে
অপরিচিতা নামহীনা মেয়ে
তোমারে দেখার আশে, দাঁড়ায়ে সভার পাশে।

বালীগঞ্জ থেকে আপার সার্কুলার রোড, এমন দূর নয় কিছু। কিন্তু সেদিন একটু দূরই ছিল আমার কাছে। অবশ্য কবিতায় বলার পক্ষে মানিয়ে গিয়েছিল। কবিতা মনের গহন থেকে বার করে আনে রোজকার ব্যবহৃত শব্দের নতুন অর্থ। যেন সারাদিনের ব্যবহৃত আটপৌরে শাড়িটা খসিয়ে ফেলে হাতে তুলে দেয় নিভাঁজ রেশমী শাড়ী।

বালু বেলায় ফেলে রেখে প্রত্যহের ব্যবহৃত শাড়ী
হে আমার শব্দ
ডুব দাও, জলের অবগাহনে।

দাঁড়িয়ে থাকিনি দরজার পাশে, বসেই ছিলাম চেয়ারে ছায়া প্রেক্ষাগৃহে। ভাবখানা দাঁড়ানো, উৎসুক, আগ্রহী, নম্রনত চিত্তমন।

সেদিন আমার জানা ছিল না শান্তিনিকেতন অধিবাসীরা তাঁকে গুরুদেব সম্ভাষণ করে থাকেন। কুন্তলামাসিমা বরাবর বলতেন ঃ

কবি। বাবা-মাকে বলতে শুনেছিঃ রবীন্দ্রনাথ। আর কারুর কারুর মুখেঃ রবিঠাকুর। কী যে হলো সেই উৎসুক কিশোরীর, সে সম্বোধন করে বস্‌লে সেই কবিতার খাতায়ঃ গুরুদেব। মূঢ় মেয়েটি ভেবেছিল, শব্দটি তারই আবিষ্কার।

আমাদের সকলকে বিস্মিত, আমাকে বিমূঢ় অথচ সুধন্য করে দিয়ে এসেছিল সেই প্রণামের আশীর্বাদ। সারা বাড়ি সাড়া পড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, রবীন্দ্রনাথের চিঠি। সে চিঠি এখনো আছে আমার কাছে। প্রায় চল্লিশ বছরে কালির রঙ এসেছে ফিকে হয়ে। সেই সুন্দর, অনুকরণে মোহজাগানো হস্তাক্ষর প্রায় মুছে যাবার মতো। সেদিনো আমি ভাবতে পারিনি যেদিন পেলাম চিঠি, আমিও এসে যাবো তাঁর শান্তিনিকেতনে। বসবো পায়ের তলায়, শিখবো তাঁর গান। শুনবো ওই আশ্চর্য সুরেলা উঁচু তার সপ্তকে বাঁধা গলার গান; ওই কণ্ঠের কবিতা-আবৃত্তি যা গানের মতো প্রায়। শুনবো নীরবস্তব্ধ, মন্দির-উপদেশ, নানা কর্মোপলক্ষ্যে ভাষণ, শুনবো আনন্দিতচিত্ত উৎসবের পাঠগুলি। নেবো তাঁর দেওয়া সাহিত্যর ক্লাশ।

যদিও শান্তিনিকেতন রূপকথার মতই আলো করে থাকতো আমার চিত্তের গহন প্রদেশ। সেদিনের বর্ষামঙ্গল দেখবার পর থেকে সে হয়ে গেল আমার স্বপ্নলোকদোসর। সেখানে বারবার চলে যাই, কিন্তু, কিশোরীর প্রেম আমার, যৌবনের সাহস নেই, সাহস পাইনে সশরীরে সেখানে বিচরণ করবো। তার রক্তবর্ণ কঠিন মাটিতে কেবল আমার বাস্তব-পদক্ষেপ একথা স্থিরচিত্তে জানতে।

মনোময় প্রণাম যতই করিনে কেন, দেহময় যে প্রণাম, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ছুটি চরণ। আর আমার নম্রনত মস্তক তাঁর ছুটি পায়ে—সেই দেহী প্রণামটি প্রথম করি শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হিসেবে গিয়েই। জুলাই থেকে সেসান স্থুরু, আমি গিয়েছি বেশ কিছু সময় পার করে দিয়ে ফাল্গুনে। ছুদিন যেতে না যেতেই নতুন ছাত্রী পরিচয় করাতে উত্তরায়ণে ডেকে পাঠালেন প্রতিমা ঠাকুর। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মংগলাকাঙ্ক্ষী আত্মভোলা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক। আমরা তাঁকে ডাকতাম মলিক্‌জী।

উত্তরায়ণ ফটকে প্রবেশ করলাম, বিকেল শেষ হয়ে স্থুরু হচ্ছে সন্ধ্যা—যাই যাই করছে গোধূলি, যাই যাই করেও দাঁড়ানো। সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে। স্মৃতিচারণার সেই কিশোরী মেয়েটি নেই, নেই মর্মর বুকের কাঁপন। তবু হে আমার স্মরণ পেটিকা, বুকের আড়াল থেকে বার করি তোমাকে, আঁচল-আড়াল থেকে। ধ্বক্ ধ্বক্ বাজছে আমার প্রৌঢ় বুক। দীর্ঘ সুদীর্ঘ পথ পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাই চলে কৈশোরক দিনটিতে। তোমার ঢাকনা খুলি, তুমি আমাকে দাও প্রথম প্রণামের সেই উথল গোধূলি।

উত্তরায়ণের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য : সুগোল, শান্ত
লাল টকটকে রঙে লেগেছে আশ্চর্য মায়া
ঘরে ফেরাবার ডাকে রঙানো আকাশ
মুঠো মুঠো আবীরের রঙ।
মাস ফাল্গুন, বাতাস নয় উতলা, স্তব্ধ বসন্ত।
প্রত্যাশার আসন্নতা নিবিড়।

উত্তরায়ণ সভাগৃহ : খোলা পশ্চিম জানালা
আর এক সূর্য : একমেবাদ্বিতীয়ম, পূর্ণবৃত্ত।
আগুনরঙে জ্বলছে জাফরানী জোব্বা
উন্নত ললাট পুড়ছে অদৃশ্য মেধাবী আগুনে
তীক্ষ্ণ মরমী চোখে, আগুন স্তব্ধ, দরদীয়া।
শান্ত বসন্ত, মুঠো মুঠো আবীর
দিনান্তর শেষ গোধূলির রাঙা
উত্তরায়ণে প্রজ্জ্বলিত প্রশান্ত অগ্নিবলয়
অভাবিত গৈরিক।

হাত জোড় করেছিলাম আমার বুকের কাছে মর্মর বাজা আমার কৈশোরক বুক, থরো থরো কাঁপা, সত্তা সংকটের দোলায় দোলায়িত।

ঋণী হলে বিষ্ণু দের কাছে বলা যায়, প্রণতঃ—

"সত্তা সংকটের তিনপর্ব যিনি বারবার হয়েছেন পার
নৈঃসঙ্গ্য ও অন্তরঙ্গতার দ্বৈতাদ্বৈতসমস্যা
সৃজনশীলতার সংকট
তিনমূলপর্বেই বারংবার পরীক্ষোত্তোরণ
পৃথিবীর ব্যক্তিইতিহাসে দুর্লভ।"

(রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা —বিষ্ণু দে)

পুরো গোটা উদ্ধৃতিতে ঋণী আমি জানি, স্বয়ং বিষ্ণুদেও ঋণী, এলিয়ট, এরিক্‌সন্, মার্টিনলুথার, ব্রেখটে। এবং রবীন্দ্রনাথে তো বটে। যেহেতু জীবন এবং শিল্পের তো ততোধিক সংগতিময়তা আসে, স্বদেশ, স্বকাল, অন্যদেশ, অন্যকাল, অন্য অন্যতর এবং অন্য অন্য স্বর সমূহের ঋণ পরিগ্রহণে।

অবশ্য সেই কিশোরী তখনো অনুশীলন করেনি বিষ্ণুদের। কল্লোল পর্বের কবিসাহিত্যিকদের পাশাপাশি ক্বচিৎ কবিতা পাঠ। সেদিনের আমি উনিশের পরিক্রমা করেছি একাগ্র, জানিনা কেমন করে মনে এসেছিল সেই বয়সেই tradition নয় বর্জনীয়। রাজাকে

প্রণাম সেরে, প্রণামান্তে বিদ্যাসাগর রাগী ইয়ং বেংগলকে দীপ্রচোখে দেখে, শিষ্য দলসহ স্বয়ং ডিরোজিওর আলাপ-আলোচনার উন্মুক্ততা, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বংগসমাজের অধ্যয়ন অন্তে সমগ্রসত্তায় স্পর্শ খুঁজে মরেছিলাম রবীন্দ্র-সত্তার। পারিভাষিক সেদিন অজানা। তবু অনুভব ঃ বয়ঃসন্ধির সত্তা সংকটে ব্যথাতুর।

উত্তরণ আকুলতা থরোথরো আকৃতির বেশে।

দূরের সহস্র প্রণাম ঃ

চিত্ত আমার নত হয়েছে বহুবার। পূর্ণবৃত্ত ঐশ্বর্যের শতদল্যান্ধমুগ্ধ। কিশোরী কালেও তাঁকেই জেনেছিলাম। যে রবীন্দ্রনাথ নন মাত্র নটরাজ আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্যে তাঁর শতবার্ষিকী পার হয়েও যা জেগে রইল ষ্টার-ষ্টাণ্ট কণ্টকিত এই আটের দশকেও।

সেদিন ছিলাম মুগ্ধ। হ্যাঁ, মুগ্ধই বলব। কাব্যমুগ্ধ, গানমুগ্ধ, নাট্যমুগ্ধ, নৃত্যনাট্যমুগ্ধ, মুগ্ধ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধাবলীতে, শান্তি-নিকেতন প্রবন্ধাবলী, হিবার্ট লেকচার, মানসী, চিত্রা, কল্পনা, সোনার তরী, বনবাণী, বলাকা, পলাতকা, পুনশ্চ, লিপিকা, পত্রপুট—রাশিয়ার চিঠি, রাজাপ্রজা, গোরা, পরেশবাবু, আনন্দময়ী, বিদ্রোহিণী ললিতা (রবীন্দ্রকন্যা রেণুকা যেন) নিখিলেশ, জ্যাঠামশাই আর—জ্যাঠা-মশায়ের সৃষ্টিধর সৃষ্টিকর্তার জাফরাণী জোব্বা অগ্নিবৎ, মুগ্ধ তো বটেই। তবু সেই রবীন্দ্রনাথেই মুগ্ধ,—

মাঝখানে কেন্দ্রবিন্দু কাব্য, গান
পূর্ণবৃত্ত এঁকে চলেছেন সমগ্রজীবন
বহে ব্যঞ্জনায়।
এস্‌থেটিকের সবগুলি রূপ ছুঁয়ে, ছেনে
মননের উঁচুনিচু সবগুলি রেখা টেনে
মানবিক, আধ্যাত্মিক, সকর্মক, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন
তাই বলে পল্লবগ্রাহীতা নয়—
কখনোই ছিলেন না জ্যাক্ অব অল ট্রেড্‌স্।

আমি এখানে পূর্ণবৃত্তের কথায় শুধুই জ্যামিতির পূর্ণবৃত্ত মনে

আনিনি। যদিও পিনপয়েন্ট কাব্য এবং গান, আর সেই পিনপয়েন্টেই জোর দিয়ে টানা বৃত্ত বা circle। তবু আমি সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করি সেই সংগেই মনে আনতে আমাদের প্রাচীন প্রতীক শতদল অথবা আধুনিক পূর্ণবৃত্ত পরিপূর্ণ গোলাপ। নানাদল, ছোট বড়ো, কিন্তু, সবগুলি মিলিয়ে আকার, রঙ, গন্ধ, পেলবতা, লাবণ্যর পরিমিত সুষমায় একটি সম্পূর্ণ সমগ্রতা।

জীবনের সামঞ্জস্য সন্ধান, অন্বেষক সূত্রে গেঁথে গেঁথে
বৃত্ত ক্রমেই হয়েছিল বড়ো, সুন্দর, সুগোল
এমনকি সত্তর পার আশীতেও
পাপড়ি ক্রমেই মেলেছিল পাতা সুগন্ধে।

দূরের সহস্র প্রণাম কাছের একটি প্রণামে মিলিয়ে রেখেছিলাম পায়ের তলায়—সৌভাগ্য নম্র। মাথা আপনিই আনত—কতক্ষণ জানি না। কখন ফিরেছিলাম স্বস্থানে,'তাও জানা নেই। খেয়াল হ'তে ঘরের অন্যদিকে তাকাই, বসে আছেন কয়েকজন য়ুরোপীয় শ্বেতাংগ, শ্বেতাংগিনী, তাঁরা অতিথি, তাঁদের মুখে হাসি স্তব্ধ, হাস্য-উদ্‌ভাসিত মলিক্‌জী। পাশেই আহ্বানকারিণী গৃহকর্ত্রী, স্নিগ্ধ সকৌতুক। বিস্মিত আমি প্রশ্ন করি,

—কী হয়েছিল ?

—তুমি একটু বেশী সময় নিয়েছিলে প্রণামে।

বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে স্নেহকণ্ঠী, মায়াময়ী প্রতিমা ঠাকুর।

সেই সন্ধ্যায় কিছু জলযোগের আয়োজন ছিল। সেদিন ছিলেন কয়েকজন বহিরাগত। আমরা কী খেয়েছিলাম আজ স্মরণ নেই। খাওয়া, টুকরো তোয়ালেতে আলগা করে মুখমোছা, সবই করে চলেছিলাম এক আবেশে, ঘুমে-জাগরনে, কি-বা। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ খেয়েছিলেন পাকা পেঁপে। টুকরো করে কেটে দেওয়া নয়। এমনি কেটে দেওয়া আধখানা। চামচে কুরে কুরে নিয়েছিলেন কিছুটা। এমনও হ'তে পারে সেই সন্ধ্যায় সেটি খাননি। খেয়েছিলেন অন্য কোনো বিকাল বা সন্ধ্যায়। সেদিনের আশ্চর্য গোধূলি, জাফরাণী

জোব্বা, পশ্চিমের জানালা দিয়ে এসে পড়া অস্তসূর্যের গাঢ়তম গৈরিক বাণভট্টের কাদম্বরীর সন্ধ্যাবর্ণনার মতো রঙের ছটার তান লাগিয়ে আমার মনে সমস্তের সংগে মিলিয়ে বাসা বেঁধে ফেলেছে হয়তো বা অন্যকোন দিনের দেখা জবা কুসুমের সদৃশ রক্তিম পেঁপেটি।

স্মরণের পেটিকা খুলে যখনি বার করি আমার জীবনের অমূল্য সময়টিকে তখনি ভাবি "দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যার মতো" এই সন্ধ্যাটিকে "ধেনু এলো গোঠে ফিরে, পাখীরা এসেছে নীড়ের যতো" এই সন্ধ্যাটিকে, "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনার" সন্ধ্যাটিকে আমি কোন সুরধারার পটভূমিকায় স্থাপিত করব? কোন রাগ একে আবৃত না করে প্রকাশিত করবে? পূরবীর বেলা যাওয়া বড়ো বেশী করুণায় উদাস, পূরিয়াতেও সেই সজলতা; ইমনে একটি নিবিড় গভীরতা। কিশোরীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, নিবিড়তা, আকুল আগ্রহ মিলিয়ে বেজে উঠুক না কেন যোগরাগের মিষ্টি মাধুরী। এই ছবিটিকে আমি যখনি দেখি আমার কানে বাজে যোগরাগে সেতার। ছবির রঙের হাসি বাজে সেতারের ছন্দে।

শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছি, সেও মধ্যদিনের সুরুতেই। তার সংগে প্রথম দেখা ঝলমলে অথচ মিষ্টি দুপুরের রোদ্দুরেই। সকালবেলা হাওড়া থেকে ছাড়ল কিউল প্যাসেঞ্জার। বর্ধমানে সংগে নিলাম সীতাভোগ, চামেলির সূক্ষ্মপাপড়ি, যেমন ধবধবে শাদা তেমনি মোলায়েম আর সুগন্ধ। তেমন হয় না আর এখন, এটা নষ্ট্যালজিয়া নয়, তথ্যই বটে। আবার ট্রেণের বৈদ্যুতীকরণ সেদিন স্বপ্নেও ছিল না মনে, কয়লার এঞ্জিন, কালো ধোঁওয়া ছেড়েছিল যখন তখন, চোখে গুঁড়ো পড়েছিল, স্বাভাবিক লেগেছিল বেশ।

এখন মনে করতে পারিনে, কেন আমরা উঠিনি বিশ্বভারতী পরিবহনে। একটা গোরুর গাড়ী নিয়েছিলাম আমরা। যাত্রী তিনজন, বাবা, আমার সম্পর্কিত এক ছোটো পাঁচবছরের ভাই আর আমি। দু'চোখ মেলে দিয়েছি। আসলে তো মেলে দিয়েছি মন, মনই তো দেখে শোনে, অনুভব করে। উৎসুক মন দেখে লালের প্রান্তর।

আমি অনেকবার দেখেছি, আমার মন চলার পথের সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে না, অনেক কিছু ছেড়ে ছেড়ে হঠাৎ কোনটাতে লগ্ন হয়ে মগ্ন হয়ে যায়। চেষ্টা করেও আমি পারিনে সব কিছুকে খুঁটিয়ে দেখতে। বোলপুরের লাল ধুলোর রাস্তা পার হয়ে চলেছি, এ বাঙলাকে লাগছে না উত্তর বাঙলার রাজশাহীর মতো, বা কলকাতার পড়শিনী লিলুয়া, বালি, বেলুড়, চন্দননগরের মতো। যেন এসে পড়েছি সাঁওতাল পরগণার কাছাকাছি। একসময় পৌঁছলাম আশ্রম সীমানার ধারেই। বাঁয়ে রেখে আশ্রম-সীমানা আমাদের গাড়ী চলেছে এগিয়ে। দু'একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ফিকে গেরুয়ারঙা।



হঠাৎ চমকে উঠ্‌লাম। চতুষ্কোণ কাঁচমন্দির, মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একটি পাহাড় টিলার অনুকরণে ছোট্ট একটি স্তূপ। জীবনস্মৃতির সেই পাতাটি অধ্যয়নলোকের দ্বার খুলে যেন রূপের লোকে প্রবেশ করল। "বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানা-প্রকার পাথরে খচিত ছোট ছোট শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ পূর্বক বলিতেন, 'কী চমৎকার। এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে?' আমি বলিতাম, 'এমন আরও কত আছে। কত হাজার হাজার। আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।' তিনি বলিতেন, "সে হইলে বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।" (জীবনস্মৃতি)

চমকের একটা তরংগ স্থুরু হতে না হতেই আরো একটা তরংগ সংখ্যাতে একেবারে দোলা লাগিয়ে দিলো। হঠাৎ ছোটো ভাই বলে উঠ্‌ল, "দিদি, দেখো, দেখো।" তার অবাক গলার অনুসরণে আমার চোখ পাখী হোলো। "দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।" গোলাকার একঘর, তাকে ঠিক্‌ মাঝখানে ফেঁড়ে ফুড়ে মাথা উঁচু করে ফুঁসে দাঁড়িয়েছে ঝাঁকড়াচুলো এক তালগাছ। পরে জেনেছি তালধ্বজ। একটি তালগাছ ছিল, তাকে কেটে ফেলে নষ্ট না করে, তাকেই ঘিরে হলো ঘর। ঘরের ভিতরে রয়ে গেল ওর গুঁড়ি, ওর দেহ। পত্র-সহশ্যামমাথাখানি ঘরের উর্ধ্বে জেগে রইল যেন সবুজধ্বজ।

আমার স্মৃতিতে শান্তিনিকেতন প্রথম দেখার এই ত্রয়ী সম্মেলন —কাঁচমন্দির, ছোট্টস্তূপ, তালধ্বজ। উত্তরায়ণ, শ্রীভবন, গ্রন্থাগার, গেষ্টহাউস, কলাভবন, সংগীতভবন, চীনাভবন সিংহসদন, রতনকুঠি, গুরুপল্লী এরা এসেছে এর পরে। তালধ্বজ বাঁয়ে রেখে ছোট্ট একটা

মাঠ পার হলাম আমরা। একটু দূরে বোলপুরের মাটির রঙে মিল রেখে গেরুয়ারঙা বাড়ীগুলি। রঙের মিল যেন কোপাইনদীর রঙের সংগে, মিল খোয়াইয়ের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের সব বাড়ীগুলির রঙ প্রায় একই রকম। যেন একই রঙের নানা টোন, যেন অবনঠাকুরের ছবি অথবা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। একমাত্র শ্যামলী আলাদা। সে যেন গগনঠাকুরের আঁকা। রঙ এক হলেও অলংকরণ পৃথক। ডিজাইন এক নয় বলে যান্ত্রিক হয়নি আধুনিক ফ্ল্যাট বা কলোনী জাতীয় গৃহ-সমাবেশের মত। পরে যখন জয়পুর গেছি, দূর থেকেই দেখছি পথের ধারের নির্দেশিকা বোর্ড—welcome to pink city, মনে পড়ে গেছে শান্তিনিকেতন, গেরুয়া আর গোলাপীর সুন্দর সংমিশ্রন, বৈরাগ্য আর প্রেমের।

আমরা অতিথি ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর। আমায় দাদামশায়ের বন্ধু, শান্তিনিকেতনের দর্শন-অধ্যাপক। তিনিই হবেন আমার স্থানীয় অভিভাবক। দিদিমা আলাপ করালেন এক ছাত্রীর সংগে। শ্রীভবন-নিবাসিনী নয়। থাকত রতনকুঠিতে। আজ তার নাম মনে নেই, কী এক মাহিন্দ্র যেন।

সন্ধ্যার আগেই শ্রীভবন। কী সুন্দর নাম। বোর্ডিং নয়, হস্‌টেল নয়। শ্রীস্বরূপা যারা তাদের ভবন। তখন খেলার মাঠ থেকে দলে দলে ফিরছে মেয়েরা। বৈকালিক ভ্রমণান্তে পায়ে পায়ে রাঙাধুলোর গোধূলি ছড়িয়ে বা কেউ, কারুর গলায় গানের দু'চরণ ঃ

"কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার
তাই কী বীণায় লাগালি যতনে নূতনতার।"

আমাকে ঘিরে ধরল বেশ কয়েকজন। তারাই নিয়ে গেল ঘণ্টা বাজলে কীচেনে। আমাদের সেই সময়ে প্রতি ভবনে আলাদা আলাদা রান্নাবাড়ী ছিল না। দুটি রান্নাবাড়ী, আমিষ-নিরামিষ, একই সংগে জোড়া। খাবার সময়ে স্কুল, কলেজ, কলা, সংগীত বিদ্যাভবন এক-জায়গায় জড়ো হ'তাম ভোজের মত। আমাদের শ্রীভবন সীমানা পার হয়ে দু'পা ফেললেই রান্নাবাড়ীর সীমানা।

রান্নাবাড়ী থেকে ফিরে শ্রীভবন বহিঃপ্রাংগণে নতমস্তকে সার বেঁধে দাঁড়ানো। নরম গলায় কিছু স্নিগ্ধতা, কিছু লাবণ্য মিলিয়ে, সুরের কোমলে রাত্রিকে সমুখে নিয়ে উপাসনা ঃ

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার।

রাত শেষ! কালকের সন্ধ্যায় গোধূলির মত, আজ উষার গোধূলি। দিন অবসানমতো রাত্রি অবসান। সূর্যাসন্ন পূর্বাকাশ, জবাকুসুমসংকাশ মহাদ্যুতি।

তিনঘণ্টা বেজে গেছে—ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্। আমাদের জাগ্‌বার ঘণ্টা। অন্দর প্রাংগণে ব্যায়াম করতে হ'বে। শ্রীভবনের দোতলা থেকে নেমে এলাম অংগনে, একতলা থেকে মেয়েরাও এলো বেরিয়ে। কিছু ব্যায়াম, ফ্রীহ্যাণ্ড এক্সারসাইজ। ব্যায়ামে ঘুমের জড় কিছু গেলো ভেঙে। স্নানশেষ, সাফাইও সমাপন। নিজেদের বিছানা ঝেড়ে বেড্-কভার দিয়ে ঢেকে, তাকগুলি সাজিয়ে পর্দা টেনে দিয়ে, ছাড়া কাপড় গুছিয়ে রেখে কাচবার জন্য বালতিতে, সাবানের একটা কেক রেখে তোয়ালে ঢাকা দিয়ে, আমরা তৈরী।

এবার ঘণ্টা বাজছে অন্যসুরে, অন্যছন্দে। এবার ঘণ্টার ডাক—এসো, এসো, এসো। সুরু হয়েছে চলা, সকলের সংগে মিলিয়ে আমিও দ্রুতপায়ে লাইব্রেরী অভিমুখ হচ্ছি। যেন চারিদিক হ'তে ধারাস্রোত বেয়ে নামছে ঝরণা, যেমন নামে পাহাড়ে। শ্রীভবনের মেয়েরা, কলাভবন, শিক্ষাভবন, সংগীতভবন, পাঠভবন, বিদ্যাভবন, বীণাভবন, হিন্দীভবনের ছাত্ররা, শিশুবিভাগের শিশুবালকদল, মাসিমা, গুরুপল্লী থেকে শিক্ষকশিক্ষিকা, গৃহিনী বা কেউ, রান্নাবাড়ার সরোজিনী মাসিমা, রাণুবৌদি, পাচক প্রভাকর—ঘণ্টা চলেছে বেজে, এসো, এসো, এসো।

এবার থেমেছে ঘণ্টা। নিঃশব্দ সময়, টানটান। থেমে গেছে পদধ্বনি, যে যেখানে গিয়েছে দাঁড়িয়ে।

অকস্মাৎ কোনো এক মন্ত্রকণ্ঠে সমবেত কণ্ঠ যুক্ত হয়ে আকাশের অভিসারী হোলো।

ওঁ পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। নমস্তেহস্তু। মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানিদেবসবির্তদুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিওম্।

যজুর্বেদের মন্ত্রগান শেষে সমবেত কণ্ঠে কয়েকজন গাইলেন দুটি উপাসনার গান। তাঁরা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন লাইব্রেরীর বারান্দায়। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম লাইব্রেরীর খোলা আঙিনায়। তখনো ঠিক জানিনে, তাঁরা কারা। পরে জেনেছি সপ্তাহ উপাসনার গান চলত, পাঠভবন, শিক্ষাভবন, সংগীতভবন, কলাভবন হিসেবে। একটি সপ্তাহের দায়িত্ব একটি বিভাগে, পরবর্তী সপ্তাহে আসতেন অন্য বিভাগে। সেদিনের গানটি ছিল সহজসুরের সহজগান।

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর
তুমি দেহো মোরে বাণী তুমি দেহো মোরে সুর।

ভারী একটি স্নিগ্ধ মন নিয়ে ফিরে রান্নাবাড়ীতে জলযোগ সেরে, ক্লাশ সুরু। শান্তিনিকেতনে ক্লাশ করতে গিয়ে আমরা এপ্রান্ত ওপ্রান্ত বেশ হেঁটেছি। আমাদের অগোচরেই হয়ে যেত দেহ চালনা। ক্লাশও হতো দু'বার, সকালে জলযোগান্তে দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত, অন্যবার খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছু বিশ্রাম নিয়ে শেষ মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

সকালের একটা দুটো ক্লাশ সেরেই ছুটি নিয়ে ফণীদাদুর বাড়ী। বাড়ীর সামনে অপেক্ষারত গো-যান। হঠাৎ বুকে ধ্বক্ করে ব্যথা বাজল। কাল থেকে একটা সুরের রেশের মধ্যে আছি—যা সুরু হয়েছে কাঁচমন্দির সেই স্তূপ আর তালধ্বজে—সন্ধ্যার গানে—রাত্রের যে দেবতা জলেস্থলে অগ্নিতে ওষধিতে—তারপর সকালের যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব—তুমি দেহ মোরে বাণী, তুমি দেহো মোরে সুর—আমার জীবনে মস্ত বড় একটা দুরাশাকে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া—হঠাৎ যেন সেতারের স্ট্রোক্‌টা গেল থেমে বাধা পেয়ে—বাবা ফিরে যাচ্ছেন কলকাতা। যে কলকাতায় মাকে ছেড়ে রেখে এসেছি আমি। বাবার

সংগে কিছুক্ষণ কথা হলো। থেকে থেকে রুদ্ধ আবেগে কাঁপছে আমার কণ্ঠাস্থি। যাবার সময় এলো। প্রণাম সারতেই দেখি বাবার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। যতক্ষণ দেখা গেল আমি রইলাম দাঁড়িয়ে —বাবাও মুখ বার করেই আছেন। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল শ্লথগতির সেই গো-যান। অথচ আমার মনে হল, বড় তাড়াতাড়িই গেল চলে। শ্রীভবনে ফিরে বিকালে সকলের চোখ এড়িয়ে আমি উঠে গেলাম ছাদে। একটি, দুটি করে তারা উঠে আকাশকে তারায় ভরিয়ে দিলো। নীরব হয়ে গেছে রাত্রি। কলকাতার তুলনায় কী নিবিড় নির্জনতা, কী গভীর নীরবতা। রান্নাবাড়ীতে খাবার ঘণ্টা পড়ল, আমি নেবে এলাম। সে রাতে, বিষণ্ণ আমি, হারিয়ে ফেললাম আমার বাক্সের চাবি। পরদিন লেখো চিঠি বাড়ীতে। এলো পার্শেলে ডুপ্লিকেট। ততক্ষণে বাক্স ভেঙে ফেলেছি আর ফিরেও পেয়েছি হারানো চাবি।

আগেই বলেছি কানুনমাফিক জুলাইতে আমি আসিনি, এসেছি ফাল্গুনের মাঝামাঝি। রবীন্দ্রনাথকে করেছি প্রথম প্রণাম। ক্লাশে যোগ দিয়েছি নিয়মিত। সন্ধ্যার আলোচনা সভা বা বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা এলে তাঁদের বক্তৃতা শুনবার জন্য যে সমবেত হওয়া, তাও বোধকরি হয়েছে। আদ্য, মধ্য, অথবা সাহিত্যিকার সভা এর মধ্যে হয়েছে কি হয়নি সিংহসদনে অথবা গ্রন্থাগার প্রাংগণে, ঠিক মনে নেই।

গ্রন্থাগার-প্রাংগণ ছাড়াও হয়ে গেছে কাঁচমন্দির উপাসনা বুধবার ছুটির দিনে। শান্তিনিকেতনে প্রতিদিনের প্রভাতী-উপাসনা লাইব্রেরী আঙিনায় দাঁড়িয়ে সমবেত। সমস্বরে মন্ত্রগানের পর যাঁরা গান গাইতেন, দাঁড়িয়েই গাইতেন। মন্দির উপাসনার বিশেষত্ব ঃ থাকতেন আচার্য, তাঁর অধিনায়কত্ব, তাঁর ভাষণ। গানও হতো বসে, কোনো গান দলবদ্ধ, কোনো গান একাকী। তানপুরা, এস্রাজ, পাখোয়াজ থাকত। বুধবার ছুটির দিন ছাড়াও মন্দির বৈতালিক হতো বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে। নববর্ষ, পঁচিশে বৈশাখ, ৭ই পৌষ, মাঘোৎসব ছাড়াও অনেক শ্রদ্ধেয়জনের স্মরণে। বেশীর ভাগই প্রভাতী। বর্ষশেষের উৎসবটি আর সহসা মৃত্যুর বিদায় দানে কখনো বা বৈকালিক।

কাঁচমন্দির চতুষ্কোণ। মেঝে ধবধবে শুভ্র। শাদা পাথরে তৈরী। মন্দিরের বাহিরে চারিদিক ঘিরে সোপানাবলী। আচার্যবেদীর সমুখে প্রতি উপাসনায় দেওয়া হতো আলপনা। ধবধবে শাদা পাথরে শাদা আলপনা—সূক্ষ্মতার ঢেউ তুলে মিলিয়ে থাকত নরম আলোর মত—উৎসবের গুরুত্ব অনুযায়ী আলপনায় হাত দিতেন কুশলী শিল্পীরা। আমাদের সময়ে চমৎকার আলপনা দিতেন কলাভবনের এক ছাত্র, মেয়েদের হার মানাতেন তিনি, যতদূর মনে পড়ে নাম ছিল শান্তি বসু। সাজানো হতো ফুল, পুড়ত ধূপের ধোঁওয়া গন্ধের হাওয়া মাতিয়ে। আচার্য আর গানের দল বসতেন মুখোমুখি। মাঝখানে

আলপনা, ফুলগন্ধ। গানের দলের পোশাকও সহজ, সরল, শাদা শাড়ী মেয়েদের, ছেলেদের শাদা ধুতিপাঞ্জাবি বা পাজামা-কুর্তা।

সোপানাবলীর যাথার্থ্য ছিল, শোভা ছাড়াও। মন্দিরের ভিতর ভরে গেলে সকলে বসতেন সোপানেই। কিংবা যাঁরা কোনো কারণে ঠিক সময়ে না পৌঁছিয়ে পৌঁছতেন দেরীতে, সিঁড়িতেই বসতেন। উপাসনা শুরু হয়ে গেলে ভিতরে প্রবেশ করা সংগত মনে করতেন না।

ইদানীং বুধবারের উপাসনায় আর যোগ দিতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীকেই দেখেছি আচার্যরূপে। মন্ত্রপাঠ করেন, অনুবাদ পড়েন বাঙলায়, তারপর বলেন ঃ সংগীত। অমনি ছড়ের টান লেগে যায় এস্রাজে।

সেদিন ফাল্গুন উনতিরিশ। দ্বিজেন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। শতবর্ষপূর্বে ফাল্গুনের এই দিনটিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম। কবিপ্রাণ অথচ ঋষির মতো মানুষটি। যাঁকে বোধকরি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরেই দিয়েছেন শ্রদ্ধা, সম্মান। তাঁকে আমরা খুব কমই জেনেছি। জীবনস্মৃতি ছাড়াও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় পৃথকরূপে পেয়েছি তাঁর আত্মচরিতে। কিন্তু, এই আত্মবিস্মৃত মানুষটি যাঁর শতবর্ষস্মরণে আমরা সমবেত হয়েছি তাঁকে আমি অন্তত জীবনস্মৃতির পাতা থেকেই যা একটু উঠে আসতে দেখেছি, তাতেই একটি শুভ্র শিশুর মতো সরল, প্রাজ্ঞ অথচ কবিমানুষকে দেখতে পেয়েছি যা ক্ষণিক চকিত-বিদ্যুৎ চমকে দীপ্ত।

জোড়াসাঁকো বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পেতে বসে সামনে একটি ছোট ডেস্ক নিয়ে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বা অন্যকিছু লিখছেন। যতটা প্রয়োজন, লিখছেন তার চেয়ে বেশী। যা রাখছেন গুছিয়ে তার চেয়ে ফেলে দিচ্ছেন অনেক বেশী লিখিত পাতা, অনেক যত্নে যা লেখা। আর যখন ও বাড়ী থেকে গুণেন্দ্রনাথ এসে হাজির হতেন এবাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায়, কাব্যালাপের সঙ্গে ঘন ঘন উচ্চহাসির আলাপ বেজে উঠে কাঁপিয়ে দিয়ে যেত বারান্দায় সঙ্গে সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাণতরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ জীবন-

স্মৃতিতে বলেছেন : “বড়োদাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের, ভাষার, কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বাণ ডাকিয়া আসিত।”

দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের যে লঘুগুরু মাত্রার ছন্দকল্পনায় মন্দাক্রান্তার লক্ষণ আনতে চেয়েছিলেন তার কিছু কিঞ্চিৎ ছিটে ফোঁটার স্বাদ আমার কপালে জুটেছিল রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনা পড়তে গিয়েই।

মন্দাক্রান্তা, যে ছন্দে কালিদাস লিখেছেন তাঁর প্রহতনুরজঃ-র মতই গম্ভীর অথচ বিরহের কাব্য মেঘদূত। সেই ছন্দটিকে হাসির উচ্চকণ্ঠ দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। মন্দাক্রান্তা ২৭ মাত্রার বিসম প্রকৃতির ছন্দ : তার পর্ববিভাস চার, এবং প্রতিটি পর্ব সমান মাত্রার নয়—১ম পর্ব আট, ২য় পর্ব সাত, তৃতীয় পর্ব সাত আর ৪র্থটি পাঁচ মাত্রার। তাছাড়াও এর গঠন পদ্ধতি আলাদা। প্রথম আট মাত্রা—৪টি যুগ্মস্বরে গঠিত। দ্বিতীয় পর্বের সাতমাত্রার সুরুই অযুগ্মস্বরের তরলতায়। ফলে যুগ্মধ্বনি বা compound syllable-এ ঘা খেয়ে শব্দ ঢেউয়ের তরঙ্গ চূড়ায় চড়ে পরবর্তী অযুগ্মধ্বনি বা simple syllable এর সমতটে ভেঙে পড়ে লুটিয়ে যায়।

কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ (কালিদাস)
ইচ্ছা সম্যক | ভ্রমণ গমনে | কিন্তু পাথেয় | নাস্তি
পায়ে লিক্লী | মন উড়ু উড়ু | একি দৈবেরি | শাস্তি (দ্বিজেন্দ্রনাথ)

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতদার অর্থাৎ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীর উক্তি রবীন্দ্র অগ্রবর্তী পথিকৃৎ হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ত্রয়ীর একটি সুষ্ঠু আলোচনা হওয়া উচিত ছিল অথচ যা হয়নি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এখন তা খুব সত্য মনে হলেও, সেই উনতিরিশ ফাল্গুনে মন্দির সোপানে বসে আমি ঠিক সেকথা ভাবিনি। শুনেছিলাম, আত্মভোলা এই মানুষটি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের নিচু বাঙলোয় অনেকদিন কাটিয়েছেন। হয়তো বা কত রৌদ্র-করোজ্জ্বল প্রভাতে উপাসনা শেষে অধ্যয়ন করেছেন নিমগ্ন, হয়তো

বা কতরাত্রি আলো জ্বেলে বসে লিখেছেন পাতার পর পাতা, আর লিখেছেন যত, ছড়িয়েছেনও তত বেহিসেবী খাতার পাতা, যেমন পাতা ঝরায় চৈত্রে শালবন। হায় হায় করে না মন।

ফাল্গুনের সকাল। ঝলকে ঝলকে সূর্যের আলো এসে পড়ছে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে। পড়ছে কাঁচমন্দির অভ্যন্তরে, শাদা আল্পনায়। মন্দির উপাসনায় এলেন রবীন্দ্রনাথ। নয়ন প্রথম দেখল সেই আচার্যমূর্তি। বসে মন্দির-অভ্যন্তরে, হৃদয় বলল, হৃদয়-গভীরে—আলো হয়ে গেল।

সেদিনের উপাসনায় কী কী গান হয়েছিল আজ আমার একেবারেই মনে নেই। মন উন্মুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের জন্য একাগ্র হয়েছিল। মন্ত্র, গান, ফুল, আলিপন সমস্ত পিছনে ফেলে রেখে নীরব এক স্তব্ধতায় প্রস্তুত করে নিচ্ছি আপনাকে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। বারবার শুধোলাম নিজেকে, কেন মৃত্যুছায়া? কেন মৃত্যুছায়া জন্মশতবার্ষিকীর উৎসবে? এতো মৃত্যুদিন নয় দ্বিজেন্দ্রনাথের। নয় তেরো বছর আগেকার ১৯২৬ এর ১৮ই জানুয়ারী বা ১৩৩২ এর ৪ঠা মাঘের শ্রদ্ধাতর্পণ।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

"নিজের কথা জানাই, জরা ক্রমশই তার ফাঁসগুলি আঁট করে দিচ্ছে, সেই ব্যবধানে প্রতিহত হয়ে জীবনলীলা চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন কথা সহজে মনে আসতে পারে।"

হয়তো রবীন্দ্রচিত্তের গভীরতম গহনতম চেতনধারায় আসা-যাওয়া করছিল মৃত্যুচেতনা। হয়তো আপন অজস্র প্রাণশক্তির উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যের মতো সগৌরব সব শক্তিগুলি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, নীরব নৈঃশব্দ্যের গভীরতলে লুপ্ত হয়ে যাবার জন্যে এমনি এক অনুভব বয়ে চলেছিল অস্পষ্ট আভাসে। কণ্ঠে তাঁর এক বেদনা অথচ আশ্চর্য এক স্থিরতা বেদনার জলধারার মধ্যখানে ভাসা নৌকার মতো।

আমি সেদিন অস্থির হয়েছিলাম ভিতরে ভিতরে। আমি মেয়ে, নারীতো বটেই। দেহের সংস্কার তিল তিল রক্তে জড়ো, গর্ভে।

দুহাতে আঁকড়াই বুকে দেহকে। চুম্বন করি, বাছা আমার। দেহ নেই—এযে নাস্তি, অসীম শূন্যতা।

বরফ আমার গলা, বরফ হৃদয়—তবু শুনে চলেছে আকাশবিহারী কণ্ঠ:

"বিনাশ যদি কোনোখানেই সৃষ্টির প্রতিকূলে সত্যরূপে থাকত, তাহলে সেই রন্ধ্র দিয়ে বহিঃসৃত হয়ে সৃষ্টি কোন্‌কালে যেত অতলে তলিয়ে, সব চলা হয়ে যেত স্তব্ধ। কিন্তু, ক্লান্তিবিহীন মৃত্যু দূর করে দেয় সঞ্চরমান কালের ক্লান্তি। প্রথমকে সে বারে বারে ফিরিয়ে আনছে শেষকে অতিক্রম করে।"

বরফ গলছে। চোখের পাতা ভিজে, ভিজে গেল বুকের কাপড়। আমি কি কোনোদিনো এসে পৌঁছব এই আরোগ্য পথে? শেষকে অতিক্রম বারবার। বারংবার নবজাতক। শুধু ইন্‌টেলেক্‌টে নয়, আকাঙ্ক্ষায় নয়, জীবনের রাজপথে, আঁকাবাঁকা সব চলাপথের গলিতে? কিন্তু, হায়রে আমি, হায়রে আমার কাল আর আমার কালের সাধনা। আমি তো রবীন্দ্রনাথ নই। মৃত্যুকে কোলে নিয়ে বারবার যিনি অমৃত অভিসারী। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, নাতি, প্রিয়তম প্রিয়তমাদের মৃত্যুতে যিনি তাঁর প্রত্যয়ের সততার অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করলেন:

১। কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়!

২। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ বেদন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।

৩। অল্প লইয়া থাকি তাই মোর, যাহা যায় তাহা যায়
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায়, হায়!

৪। দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—লজ্জা দিয়ো না
সকলের নয় যে আঘাত ধরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে, রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি
কৃপণ হোয়ো না।

১৯৩৯ এর দোলপূর্ণিমাই শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম দেখা দোলপূর্ণিমা, বসন্ত-উৎসব। আগেকার দোল যত ছেলেমানুষীর খেলা, হুজুগের হোরী। গভীরে ছোঁয়নি কোনোকালে। বড়ো হয়ে আমি এড়িয়ে গেছি দোলের রঙ্‌ খেলা, হৈ হৈ, মাতামাতি। কিন্তু, আজ বসন্ত-পূর্ণিমা আমার। "ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনে সন্ধ্যাকালে।" অবশ্য মাস চৈত্র, সময় রাত্রি নয়, দিন। স্থান শান্তিনিকেতন থেকে একটু দূরে গোয়ালপাড়া গ্রামে।

আমরা সকালবেলাতেই রওনা হলাম হাঁটাপথ ধরে রতনকুঠি বাঁয়ে, পাশে ফেলে আওয়াগড় ভবন, আমরা চলেছি এগিয়ে। মাঠ ভেঙে, কেয়ার ঝাড় পাশে রেখে, বুনো কুল পেড়ে খেতে খেতে চলেছি। নদী পার হলাম, পায়ের পাতা ডোবা জল, কে বলবে বর্ষায় এই নদীই উঠবে বুকজলে ভরে। আমরা শর্টকার্ট করছি। গুরুদেব আসবেন গাড়ীতে রাস্তা ধরে। আমাদেরো আগে রান্না-বাড়ীর একদল কর্মী রওনা হয়ে গেছে। আমরা এখন গিয়ে শুরু করব আর একটু প্রস্তুতি। যেন বাজাবার আগে এস্রাজ, সেতার, তানপুরোর কান মুচড়ানো, তার ঠিক করে বাঁধা, তবলায় হাতুড়ি ঠুকে নেওয়া ঠক্‌ ঠক্‌ করে, যাকে বলে সুর বেঁধে নেওয়া।

বড়ো বড়ো ছায়াঘন গাছ, রাজবতুন্নত। গাছগুলি ছিল আসলে বট অশ্বত্থ। যে গাছগুলি দেখলে আমার প্রায়ই মনে হয়, বিশাল করতলের ছায়া মেলা অভয় মুদ্রায়, অজন্তার সেই বোধিসত্ত্বের মতো।

সারা জীবন স্বপ্ন : একটি বৃক্ষ মহীরূহ
সারা জীবন সাধ : ব্যাপ্ত গহন ছায়া।
এমন মরুর মাটি, শুধু গুল্ম, শুধু লতা
কখনো তাও নয়, স্বপ্ন সাধ মরে ধু ধু মরু
রঙে ব্যথা ছড়ায় ক্যাক্‌টাসে ফুল।

সেই কিশোরী কালে স্বপ্নটা মরে যায়নি। অভয় মুদ্রাই দেখেছি দাক্ষিণ্যের। খুব সাধ হতো নামটা বদলে গিয়ে হয়ে যায় সুদক্ষিণা। সেদিন প্রসন্নতার ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্নাত। গাছগুলির ঘন ছায়াতলে যখন বিছানো হলো সতরঞ্চ, ভারী ভালো লাগল। কিছুদূরে রান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে, অনেক মহিলা আর কোনো কোনো ছাত্রী গেলেন সেখানে। একটু পরেই গুন্‌গুন্ গুঞ্জন। গুরুদেব এসে গেলেন।

ছায়াঘন বৃক্ষতলে বৃক্ষসম সমাসীন রবীন্দ্রনাথ। প্রসন্ন ছায়া বিছানো। আমাদের সেদিনের রংগমঞ্চের মঞ্চ সেই সতরঞ্চি বিছানো জায়গাটুকু। দৃশ্যপট এদিকে ওদিকে দাঁড়ানো গাছগুলি, ঘনগুঁড়ি, আঁকাবাঁকা ডাল, গাঢ়সবুজ পাতা। উৎসবের নটরাজ মঞ্চতলে আসীন, আর আমরা নন্দীভৃংগীরা তাঁকে ঘিরে।

নটরাজের কথা যখন উঠ্‌ল একটুখানি বলে নিই। সাহিত্য-পাঠের দিক থেকে যে শিবকে জেনেছিলাম তিনি ধ্যানমগ্ন, যোগী। দেহের সৌন্দর্য দিয়ে উমা যাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে শুধুমাত্র বিরাগভাজনই হয়েছিলেন, যাঁর ভ্রুকুটিতে নিমেষে মদন ভস্ম হলো। দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়ে দেখলাম যে শিবকে, তিনি নটরাজ। নৃত্য এবং অভিনয়ের প্রভু এবং রাজা। দেহখানি নৃত্যপর। আনন্দকুমার স্বামী তাঁর The dance of Shiva বইতে বলেছেন :—

The cosmos is His theatre, there are many different steps in this repertory.

আরও বলেছেন :—

When the Actor beateth the drum
Everybody cometh to see the show
When the Actor cottecteth the stage properties
He abideth alone in His happiness.

তাঁর একপদপাতের মুদ্রায় জন্মের লীলা, অন্যপদপ্রান্তের মুদ্রায় সংহত

স্থির সব লীলার তরংগরাশি। রবীন্দ্রনাথ এই বস্তুকেই হয়তো বলেছেন,

নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

শান্তিনিকেতনকেই বলব cosmos এমন স্পর্দ্ধা রাখিনে, রবীন্দ্রনাথকেও বলতে পারিনে the Actor. তবু আমাদের চিত্তে সেদিন ছিল এই Actor আর cosmos এর লীলা। আমরা সেদিন এই ভাবেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে। যাঁরা তা দেখেননি, তাঁদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়েই বলি, রবীন্দ্রনাথকে আমরা শান্তিনিকেতনবাসীরা রাজা বলেই জেনেছি, হয়তো অনেক অশান্তিনিকেতনেরাও জেনেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের মুগ্ধ মন এই কথাটাও জেনে নিয়েছিল ঃ

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।

আমরা সবাই রাজা। (অরূপরতন)

উৎসব শুরু হলো, আমরা একে একে প্রণাম করে গুরুদেবকে, শিক্ষক শিক্ষিকাদের, পরিয়ে দিচ্ছি ছাত্রছাত্রী সকলেই সকলের ললাটে একটি মাত্র টিপ্ বা টীকা। জড়িয়ে ধরা নয়, গাল লাল করে দেওয়া নয়, শুধু ফোঁটায় ফোঁটায় ললাট-কপাল রঞ্জিত। আমাদের সঙ্গে গ্রামবাসীরাও যোগ দিয়েছেন কেউ কেউ, তাঁরাও প্রণাম করছেন গুরুদেবের পায়ে আবীর দিয়ে। জিজ্ঞাসা করছেন—ঠাকুর, ভালো আছো ?

উদ্বোধনে গুরুদেব স্বকণ্ঠে পড়লেন কবিতা

আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমা রাত্রি
উপছায়া চলা বনে বনে মন আবছা পথের যাত্রী।

এ জীবনে তাই রাত্রির দান, দিনের রচনা জড়ায়ে
চিন্তা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রস সঞ্চারে ভরিছে ফসলে ফুলে

অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে ফেলিছে রঙিন ছায়া
বাস্তব যত শিকল গড়িছে, শিকল গড়িছে মায়া। (অস্পষ্ট, নবজাতক)

আমি শুধু শুনছিনে, দেখছি দু'চোখ মেলে। দেখছি সুরের ওঠা-নাবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ পৌরুষেয় অথচ শোভন হাতের আঙ্গুলগুলির সুন্দর ওঠা-পড়া। যেন কথা কয়ে ওঠা নৃত্যছন্দের মুদ্রা। অথবা কথার চেয়েও বেশী, কথা, সুর আর ভঙ্গীর ত্রয়ী সম্মেলনে সুদূবতা।

এদিকে দিনের চৈতালী রোদ্দুর চমক লাগাচ্ছে ঘনসবুজের ফাঁকে ঘনকালোয়। রবীন্দ্রনাথের জোব্বা যেদিন জাফরাণী নয়, গৈরিক নয়, নয় চাঁদের আলো গরদ ঃ কৃষ্ণরাত্রি অমাবস্যা। কালো জোব্বা, কালো টুপী মাথায়। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণবর্ণবেশ অনেককে বেশী মুগ্ধ করেছে; তাঁর সেই তুষারশুভ্র গৌরবর্ণ কালোর পটভূমিকায় আরো উঠ্‌তো তুষার শুভ্র হয়ে। যেমন "আমাদের শান্তিনেকেতন" বইতে হিন্দী লেখিকা শিবাণী ওরফে গোরা পন্থ তার প্রথম দেখার বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছে ঃ

"স্ফটিক সা গৌরবর্ণ, জ্বলন্ত জ্যোতি সে জগমনাতে বিশাল নয়ন, গোরে ললাট পর চন্দন কা শুভ্রতিলক, কালা ঝব্বা অউর কালী টোপী।" (আমাদের শান্তিনিকেতন—শিবাণী)

আমার প্রথম কাছে থেকে দেখা কালো আলোয় নয়। সময়টি ছিল "দিবাবসানে লোহিত তারকা তপোবন ধেনুয়িব কালা পরিবর্ত-মানা সন্ধ্যা।" ছিল পশ্চিমের খোলা জানালা।

আগুনরঙে জ্বলা জাফরাণী জোব্বা। অদৃশ্য মেধাবী আগুনে পুড়ছিল উন্নত ললাট আর তীক্ষ্ণ মরমী চোখে আগুনস্তব্ধ, দরদীয়া। সেই গৈরিকের তান লাগানো আগুন রঙ, সে যেন রঙ নয়, কোনো রাগের মেলডি। স্বরের কড়ি ও কোমলে আধআধ পর্দায় একটি, দুটি শ্রুতির আরোহণ, অবরোহণ, নীড়ে. মূর্ছনায় প্রকাশিত। কনট্রাষ্ট নয়, টোন, একটি রঙের স্তরে স্তরে ভেঙে পড়া ছড়িয়ে পড়া সূক্ষ্মতা। আর সে রঙটি আগুনের, সে রঙটি গৈরিক, সে রঙটি রক্তিম। সে রঙটিতে মননের উজ্জলতা, প্রেমের রক্তিমতা আর বৈরাগ্যের নিরাসক্তি।

সাহসী কেউ কেউ বলে উঠল : গুরুদেব দোলের দিনে কেন কালো কাপড় ?

জবাব দিলেন,—ওই রঙেই তো মিলবে আমার সকল উজ্জ্বল রঙ।

তার সময় হয়ে এলো।

আবার মৃত্যুর ছায়া। বুক হিম হয়ে ওঠে আমার। ভাবি, তাঁর অন্তঃশ্চেতনায় চলছে মৃত্যুর আসা-যাওয়া। কিন্তু, মৃত্যু যাঁর অমৃতও তাঁরি। এ ছিল রবীন্দ্রচিত্তের সমাহার—তাই পরক্ষণেই উৎসবমুখর হয়ে উঠি আমরা।

মোহরের সোনাগলানো গলার গান বেজে উঠল বাঁশিতানে। ইন্দুদির বেদন-সুধা। ইন্দুদির গান আমি যখনি যতবার শুনেছি মনে হয়েছে বেদনার এতখানি মাধুরী বড়ো দুর্লভ, সহজে মেলে না।

সমবেত ঐকতান সুরু হলো।

১। বাকি আমি রাখবো না কিছুই
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।

২। তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে।

শুরু হলো হাসু, অনু, মমতার সম্মিলিত নাচ। বনঅরণ্যই সজ্জা, তপোবনবাসিনী যেন। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা। সবুজ কোমলপাতা গুঁজেছে খোঁপায়, বেণীর শিখরে, কানে শালফুলমঞ্জরী, কপাল আবীরে রাঙা, আঁট করে জড়িয়েছে শাড়ীর আঁচল কোমরে। মৃদংগে তাল লাগাতে লাগাতে উৎসাহী মণিপুরী নৃত্যশিক্ষকও মৃদংগ ছেড়ে যোগ দিলেন নাচে।

পরদিনই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন “জবাবদিহি”। স্পষ্টতর হলো তাঁর দোলের দিনে কালো কাপড় পরার অবচেতন মনের গূঢ়ার্থ :

দোলের দিনে, সে কী মনের ভুলে, পরেছিলাম যখন কালো কাপড়।
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে, হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকালবেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা।
কালো এসে আজ লাগলো বুঝি, শেষপ্রহরে রঙহরণের পালা।

এনড্রুজকে দেখব,—আমার অনেকদিনের সাধ। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, এনড্রুজ, ক্যামেরার শাদাকালোয় প্রতিবিম্বিত ছবিটা চোখের আলোয় জেগে উঠবে তার স্বাভাবিক রঙে, মন পাবে কিছু সাহচর্য। নিবেদিতা, এ্যানিবেশান্তও কিছু নাড়া দিয়েছিলেন, তবু আমি ভেবেছি যখনি পড়েছি তাঁদের কাহিনী—দুই মহিলাই আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসিনী, সেদিন আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাগ্যও বেদনার সূত্রে গাঁথা ভারতবর্ষের সংগেই। দুজনেই ব্রিটিশরাজত্বের ইউনিয়ন-জ্যাকের পতাকাতলে।

এনড্রুজ স্বতন্ত্র, এনড্রুজ অনন্য, এনড্রুজ নিজেই যে ইংরেজ। সেই যে মানুষটি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন, গীতাঞ্জলি সন্ধ্যায় আমার জন্মের অনেক আগে লগ্ন করলেন চিত্ত রবীন্দ্রনাথে, সেই মানুষটিকে দেখব। আমার অনেকদিনের সাধ।

খৃষ্টের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাশীল মানুষটি ভালোবেসেছিলেন ভারতবর্ষকে, গান্ধীজীকে। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেছিলেন, তাঁর গীতাঞ্জলি, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, আর শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উন্নয়নের কাজে বাঙলার গ্রাম্য মানুষগুলিকে। পরবর্তী জীবনে এইরকম আর একটি মহৎ প্রাণের পরিচয় আমরা পেয়েছি ; যিনি গ্যয়টের দেশ থেকে, ম্যাক্সমূলরের দেশ থেকে, বিটোভনের দেশ থেকে সোপেনহাওয়ায়ের দেশ থেকে, হায়নে, রিল্‌কের দেশ থেকে, এসে বেছে নিলেন সারা জীবনের জন্য আফ্রিকা। আফ্রিকার কৃষ্ণমানুষ-গুলিকে অন্তর থেকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন, তার জন্য দিনে দিনে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন এবং আপন স্ত্রীকেও। সেদিন অবশ্য আমি সোয়াইট্‌জায়ের কথা জানতাম না। জানতাম এনড্রুজকে, যিনি দূর থেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বিত। গীতাঞ্জলি

সন্ধ্যায় শ্রদ্ধাটি রূপান্তরিত হলো প্রীতি, প্রেমে, বন্ধুত্বে। স্থান-কাল-পাত্রের ত্রিবেণীসঙ্গম সেই সন্ধ্যাটিকে আমরা একবার স্মরণ করে নিই।

আজ থেকে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি বছর আগেকার দিনে আমরা যাই পিছিয়ে। চলে যাই আমাদের স্বাধীন ভারত থেকে পরাধীন ভারতের প্রভুদেশ ইংল্যাণ্ডে। আজ যারা কিশোর-কিশোরী তাদের পক্ষে দুরূহ পিছন ফিরে এই সময়টিকে অনুধাবন করা, তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।

তখন ভারতবর্ষ অধীন ইংল্যাণ্ডের। তবু কিছু কিছু এমন ইংরেজ দেখা গেছে, ভারতবর্ষের মনন, মেধা ও শিল্পশক্তিকে সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি। এমনিই একজন ছিলেন, ব্রিটিশ শিল্পাচার্য উইলিয়াম রোদেনষ্টাইন। যিনি ১৯১০ কি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ছিলেন কিছুকাল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা। তাঁর আসা যাওয়া ছিল অবনীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবনে, যে বিচিত্রাভবন ঘিরে শুরু হয়েছিল ভারতীয় শিল্পকলার পুনর্জাগরণ। হঠাৎ একদিন বিচিত্রাভবনেই রোদেনষ্টাইন দেখলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ভাবগম্ভীর চেহারা বৃটিশ শিল্পাচার্যকে বিচলিত করেছিল শিল্পী হিসাবেই। এতই উন্মথিত হয়েছিলেন যে আপনাকে সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর স্কেচ করবার অনুমতি চাইলেন। এঁকেছিলেন অপূর্ব স্কেচ। রবীন্দ্র আকৃতি পার হয়ে রবীন্দ্র প্রকৃতির গভীরতম প্রকাশ ঘটেছিল। আমার মতো যাঁরা রোদনষ্টাইনের রবীন্দ্র-স্কেচটিকে দেখেছেন, নিশ্চিত অনুভব করেছেন শিল্পীর চোখে কবি-শিল্পীকে দেখবার বিশিষ্ট গভীরতা। যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে এই স্কেচটি দেখবার, লেখিকার মতই মুগ্ধ হয়েছেন নিশ্চিত।

এই ঘটনা থেকে শিল্পী এবং কবির যে পরিচয় শুরু হলো, পরিণতি পেলো গভীর প্রীতিতে। রোদেনষ্টাইনের বাড়িটি ছিল, তখনকার ইংল্যাণ্ডের নামী আর উদীয়মান প্রবীণ এবং তরুণ লেখক-লেখিকা, শিল্পীদের মিলনভূমি। যেমন ছিল, আমাদের বাঙলায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, পার্কসার্কাস অঞ্চলে চৌধুরী পরিবার।

সংস্কৃতির ক্ষুধা যাঁদের অন্নজলের ক্ষুধার চেয়ে কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রোদেনষ্টাইনকে উৎসর্গ করলেন তাঁর ইংরাজী গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলি সম্পর্কে হয়তো একটুখানি বলা অপ্রাসংগিক হবে না। আমরা বাঙালীরা যে গীতাঞ্জলিকে জানি, যার গান আমাদের ঘরে ঘরে অনেক মানুষের কণ্ঠে। কানে, প্রাণে, ইংরাজী গীতাঞ্জলি ঠিক সেই গীতের অঞ্জলি নয়। বাঙলায় গানগুলির ভাষা প্রাঞ্জল হলেও ধ্রুপদী স্থাপত্যে সৃষ্ট। অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ চারস্তরকে বাঁধা এবং সমিল ছন্দে। অন্ত্যে মিল ছাড়াও, পর্বগঠনেই আছে ছন্দভাগ। ইংরাজী গীতাঞ্জলি সমিল নয়, ছন্দের পর্বগঠনের নিয়মিত ভাগে ভাগ নয়। ঠিক যাকে গীতাঞ্জলির কবিতা বলি, সেই কবিতা নয়। কিন্তু, লিপিকা যদি হয় কাব্য, তাহলে ইংরাজী গীতাঞ্জলিও কাব্য। বাইবেলের সাম্স্ যদি হয় গান, তাহলে ইংরাজী গীতাঞ্জলিও গান। বাইবেলের সাম্স্-এর সংগে অন্তঃপ্রকৃতির মিল। অমিল এবং গদ্য হয়েও অন্তর্নিহিত একটি সুর ও ছন্দে স্নাত। নির্মাণের দিক থেকে বক্তব্য ঃ ঠিক গীতাঞ্জলির অনুবাদও বলা চলে না, এমনকি সংগ্রহও স্বতন্ত্র। গীতিমাল্য, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, চৈতালী, স্মরণ, কল্পনা ও উৎসর্গ থেকে সংকলন, অর্থাৎ চয়নিকা। গীতাঞ্জলির গান অর্ধেক, আর অর্ধেক অন্যান্য সঞ্চয় বলেই গীতাঞ্জলির নাম সার্থক হতে পারল।

এবার আমরা দুচোখ মেলে দেখি, শিল্পী রোদনস্টাইনের সেই বৈঠকটি, ৩০শে জুনের সন্ধ্যায় যেটি অনুষ্ঠিত হলো। জনকয় সাহিত্যিক, সাহিত্য-রসিক কয়েকজন, তার মধ্যে অধিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ। এক একটি কবিতাপাঠ, কবি ইয়েটসের উতলা কণ্ঠে। উতলা, যেহেতু তাঁর চিত্ত জেনেছিল Imitation of Christ এর সমতুল্য এই কাব্য-গ্রন্থ গীতাঞ্জলি আবার ঠিক একও নয়, একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থিৎ। পাপদ্বারা বিধৃত তো নয়—ক্রিশ্চিয়ানিটির সেই sin অজর, অমর, অব্যাহতিহীন অথচ negative, সেই না-ধর্মীতা নেই কোথায়ো—। বরং

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দজাত, আনন্দেই জীবিত এবং আনন্দেই পুনঃপ্রত্যাগতের জন্মমরণ, দুঃখ-সুখ, প্রেমের বিরহমিলনের ছন্দের দোলন। তাই বাইবেলের মতোই নিবিড় অথচ বাইবেল নয়। স্বতন্ত্র রসবিশিষ্ট। কাছের মানুষকেও যখন সত্য করে দেখি, তখন সে ঠিক কাছের নয়, তার অনেকখানিতেই নিবিড় একটি সুদূরতা ঠিক তেমনি। কিছু চিনি আর কিছু চিনিনা, রহস্যময়তার আবেশেই কবি ইয়েটস হয়েছেন উতলা, গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি বহন করেছেন সব সময় সঙ্গে। ট্রামে, বাসে, ট্রেণে ততক্ষণই চলেছেন পড়ে, যতক্ষণ না সম্বিত ফিরেছে, বুঝতে পেরেছেন সহযাত্রীরা কৌতুহলী তাঁর মুখে ইমোশনের প্রগাঢ় প্রকাশে।

সেই সন্ধ্যা অনেকেরই চিত্ত উন্মথিত করেছিল। কুমারী র‍্যাডফোর্ড অনুভব করেছিলেন বাইবেল পাঠের গভীরতা। মিস্ সিন্‌ক্লোয়ার বিস্মিত, এ যে সেণ্ট জনকেও অতিক্রম করল।

এনড্রুজের আলোড়ন চলে গেল গভীরতম গভীরে। জল ভরে গিয়ে পূর্ণকুম্ভ শব্দহীন, নিঃশব্দ। এনড্রুজ সে রাত বিনিদ্র, অতন্দ্র। আবেগে, চিন্তায় মথিত। যেটুকু ছিল তাঁর বেড়া, ধর্ম, দেশ, যা তাঁর জন্মজাত, শিক্ষাগত এবং upbringingএর ফলস্বরূপ, তা গেল ভেঙে।

কেন জানিনে আমার অনেকদিন ভাবতে বেশ ভালো লেগেছে. গীতাঞ্জলি সন্ধ্যার রাত্রিতেই রোদেনষ্টাইন বৈঠক থেকে বার হয়ে এনড্রুজ পথে পথে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একাকী। তারপর গভীর রাত্রে ঘরে ফিরে অতন্দ্র পায়চারি। তারো পরে গভীরতম রাত্রে, অন্ধকার যখন আলোতে মিলবার জন্য উৎসুক, হলেন নতজানু, হলেন স্থির। আনন্দ-পুলকিত হৃদয়ে অদৃশ্য রাখী বাঁধলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হাতে, বাঁধলেন পুবদেশের মানুষগুলির নম্র, বেদনাশীর্ণ হাতগুলিতে, আর বোধ করি উচ্চারণ করলেন গভীর মুদিত দুই নয়নে ঃ

আমার জীবনের পরমতম ঐশ্বর্য
আমার ঈশ্বরের হাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন থেকে চলে আসি ১৯৩৬ এর ২০ মার্চ। তুলে ধরি এনড্রুজের লেখনের একটুকরো।

"Twenty five years ago, my whole heart was given to the poet, Rabindranath Tagore, and it has remained with him ever since. He has been my Gurudeva, teaching me to understand and love humanity in the East no less than I had learnt in earlier years, to love in the West.

* * *

It has been a supreme treasure in my life, the greatest gift God has given me in human ways."

আমি যখন পৌঁছলাম শান্তিনিকেতনে, এনড্রুজ ছিলেন না তখন। অসুস্থ হয়ে কলকাতার নার্সিং হোমে। খৃষ্টজন্মোৎসবে তিনি শেষ ভাষণ দেন মন্দিরে। মাত্র কয়েকটি মাসের জন্য আমার শোনা হল না। তাঁর কাহিনী শুনেছি ক্ষিতিদাদুর কাছে। কেউ কখনো আগে নমস্কার করে উঠতে পারতেন না তাঁকে, পরামর্শ করেও নয়। তাঁর কর যুক্ত হতো সর্বাগ্রে। এ টিকেট দস্তুর বাঁধা মাপের বরাদ্দে যুক্ত নয় সেই করজোড়। যুক্ত শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্ভ্রমে।

এপ্রিলের পঞ্চম বিকাল। উপাসনার কথা কিছুই ছিল না, তবু মন্দিরের বৈকালিক উপাসনার ঘণ্টা বেজে চলেছে বড়ো বেদনায়। দীপ নিভে গেছে। যে দীপশিখা নিভু নিভু হয়েও আমাকে দিয়ে চলেছিল এক আশ্বাস, সেরে উঠবেন এনড্রুজ, ফিরে আসবেন শান্তিনিকেতনে। তাঁকে দেখব। আমার অনেকদিনের সাধ।

উপাসনায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ: কালো চশমায় ঢাকা চোখ। চোখ তো দর্পণ মানুষের ভিতরের। অন্তরের গভীর ক্রন্দন আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন সকলের থেকে। রবীন্দ্রনাথকে আমি দুবার

দেখেছি এমনি কালো গগল্‌সে, আর তুবারই মন্দিরে। বারবার বললেন: "ভারতবর্ষের কাছে কী অসামান্য আত্মোৎসর্গ।" বারবার গলা নেবে পড়ছে খাদে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আকাশবিহারী উদ্দ-গীচ নয়, ডানা মেলা নয়, স্বর অবরুদ্ধ থেকে থেকেই।

আমি মেয়ে, নারী তো বটেই। দেহের সংস্কার তিলতিল রক্তে জড়ো, গর্ভে। ভালোবেসে দেখলে:

দেহ আমার নদীজল: ক্লান্তিধোওয়া স্নান
দেহ আমার নীল আকাশ: পাখ্‌নার উধাও সাঁতার
দেহই সেতু দেবার-নেবার
দেহ নইলে দিতে পারিনে যে; ভরা হাত শূন্য।

হয়তো বা রবীন্দ্রনাথকেও সেদিন বিদ্ধ করেছিল আমার মতো নারীর বেদনা। সান্ত্বনা মেলেনি, মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁরি, এই মন্ত্রবাণীতে। কিছুকালের মতো অধ্যাত্মবাদী ঋষি অপেক্ষা বড়ো হয়ে গিয়েছিল সংবেদনশীল কবি, নিরাসক্তি অপেক্ষা প্রেম। নিজের লোক, ক্ষতিকে নিরাবরণ হয়ে সকলের কাছে সকরুণ হয়ে যেতে দিতেন না তিনি, তাকে নিয়ে যেতেন গোপনতম গহনে। তবু সেদিনের ভাষণে থরোথরো কেঁপেছিল লোকের করুণা।

হয়তো সমাপন-সংবাদে মুহূর্তের মধ্যেই কথিত হয়েছিল অনেক-গুলি বছরের অনেক দিনরাত্রির বন্ধুত্বের কাহিনী। আমি যেটুকু বুঝেছি উভয়ের চিঠি পত্রের আদান-প্রদান থেকে, এনড্রুজ এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের অনুভবও ছিল পৃথক দুই কক্ষের। এনড্রুজের যা একান্ত ব্যক্তিক, personal, রবীন্দ্রনাথের সেই বস্তুই অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক, impersonal এবং poetic. এনড্রুজ তাঁর প্রেমের সব খানি বন্ধুকে দিয়ে প্রত্যাশায় থাকতেন বন্ধুর কাছ থেকে প্রেমের প্রত্যভিবাদন ফিরে পেতে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে থেকে যেতেন অনেকখানিই দূরের হয়ে। সমস্ত কবি, শিল্পী, সব প্রতিভাধরেরই থেকে যায় নিরাসক্তির একটি কঠিন আবরণ। প্রেমিক, বন্ধু, অগাধ প্রীতিধর, অসীম স্নেহশীল হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠিন নিরাসক্তি ছিল

রবীন্দ্রনাথেরও। ভালোবাসাকেও তিনি রাখতেন দূরতম প্রদেশে, যেন তাঁর জীবনপ্রবাহ, সৃষ্টিপ্রবাহে সে কোনো বাধা না আনে।

প্রতিভাধর, সৃষ্টিধরের মধ্যকার এই যে অন্তর্নিহিত দূরত্ব-বোধ, আত্ম-গৌরব বোধ, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বস্তু এসে পড়লে হয়তো বা হয়ে যায় স্বার্থপরতা। কেন না, তার হাত থেকে আমরা তার অতিরিক্ত কিছু পাইনে। কিন্তু, সৃষ্টিধরের কঠিন নিষ্ঠুর হাত থেকে পাই সৃষ্টি, আমাদের অস্তিত্ব আলোকিতা।

কোনো একদিন এনড্রুজের গভীর আকাঙ্ক্ষাময় নিবিড়তররূপে প্রাপ্তির প্রত্যাশার জবাবেই হয়তো বা লিখেছিলেন :

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয় মিলায় পলকে
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে।
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান
হোক্ ফুল হোক্ তাহা গান।

(বলাকা—রবীন্দ্রনাথ)

বুঝি, পাঁচ এপ্রিলের সেই চৈত্রমাসের পাতা ঝরানো হায় হায় দিনে ব্যথা বেজেছিল বুকে নিরন্তর। বন্ধুর প্রতিদান বুঝিবা হয়নি দেওয়া। গলা এসেছে ধরে থেকে থেকেই, ভেঙে ভেঙে নেবে নেবে পড়ছে খাদে। তাই চোখের ব্যথিত উদ্‌ভ্রান্ততার আবরণ কালো চশমার চাহনতা।

এনড্রুজের মৃত্যুর পাঁচদিন পরে ১৯৪০ এর ১০ এপ্রিল লিখলেন একটি গান। বেদনায় শরবিদ্ধ।

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হোল তারে—
দিইনি তাহারে আসন।

বিদায় নিল যবে শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে
সে তখন স্বপ্নকায়াবিহীন
নিশীথ তিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা, রঙীন মরীচিকা। (গীতবিতান)

দেহ নেই, এ যে নাস্তি, চিরহাহাকার।
দেহই সেতু দেবার এবং নেবার
দেহ নইলে দিতে পারিনে যে ; ভরা হাত শূন্য।

শান্তিনিকেতনে তখন নববর্ষ আর পঁচিশে বৈশাখের জন্মদিন উৎসব হোত বৈশাখের প্রথম দিনেই। যেহেতু পঁচিশে বৈশাখে শান্তিনিকেতন পায় না রবীন্দ্রনাথকে, ছেড়ে দিতে হয় হিমালয়-যাত্রায়। প্রতিবার যেমন ঐশ্বর্যের ঘনঘটায় ঝলোমলো দ্বৈত-উৎসব, তেমন হলো না এবার। হলো না নৃত্যনাট্য, মালিনী নাটকের অভিনয়। এনড্রুজের মৃত্যু মস্ত বড়ো আঘাতের মত পৌঁছেছে গভীরে।

নববর্ষ উৎসব সুরুর আগে বর্তমান বছরের শেষদিনে বর্ষশেষ উৎসব। সেদিন চলে যাচ্ছে। যা কালই হয়ে যাবে কালকের, তাকেও সমাদর জানায় শান্তিনিকেতন। এই দিনগুলি দুঃখ সুখের দোলায় দুলিয়েছে, সুরে, শিল্পরসে করেছে উদ্বোধিত, কাব্যে, মননে করেছে উজ্জ্বল, জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় কিছু অভিজ্ঞ, তাকে অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতা।

বর্ষশেষের বৈকালিক উপাসনা চৈত্রের শেষদিনে। বিকাল শেষ হয়ে আসছে, সুরু হচ্ছে সন্ধ্যা। আমরা গাইলাম মন্দিরে ঃ

"আঁধার এলো বলে,
তাইত ঘরে উঠ্‌ল আলো জ্বলে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে যা অনুভব করেছেন, সেই অনুভবটিকে রাখতে চেয়েছেন আমাদের অনুভূতির কাছটিতে। আঁধার যেমন সত্য, সমাপনও সত্য। যেহেতু শেষের পরেই আবার সুরু, আঁধার আলোকের দূতী, মৃত্যুদূত নবীন জন্মের। জানি না শান্তিনিকেতনেরই ক'জন আমরা নিতে পেরেছি তাঁর আঁধার-আলোর দীক্ষা। গান তো গাই সকলেই।

জেগেছি রাত থাকতে অন্ধকারে। শ্রীভবনের শেষতম পুবের ঘরে আলো প্রথম প্রবেশ করল হাসিমুখে ঃ

"আজ নববর্ষ, আজ জন্মদিন"

দিন সমস্তই এক, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, আঁধার পার হয়ে আবার সূর্যোদয়। দিনের মালা গাঁথার দিন চলেছে এগিয়ে। দিন, সপ্তাহ, মাস, ঋতু, বছর। আবার সবদিন পৃথক। কোনোদিনই ফেরানো যায় না। কিন্তু, যে দেখে মালার একটি ফুলকেও মনের আলোয় ভরে চোখের আলোয়, সে বলে তুমি ধন্য, আমিও ধন্য। সৃষ্টিতে নেই পুনরাবর্তন, অদ্বিতীয় তুমি ধন্য, আর আমি ধন্য দেখলাম সেই নূতনকে। মানুষ তাই আদর জানিয়েছে দিনগুলিকে। বর্ষশেষ, নববর্ষ, জন্মদিন তুমি, বিজয়া, বড়োদিন, ইদের চাঁদের হাসি, দেয়ালীর শালমুবারক, আর হাল আমলে ম্যারেজ এ্যানিভার্সারী আর হ্যাপি বার্থ-ডে-টু্য ইউ।

বাজছে মন্দিরে ঘণ্টা নববর্ষ সংরাগে। শালবীথির মধ্যদিয়ে পুলকিত পায়ের পদক্ষেপে চলেছি। দু'একটি শালফুলমঞ্জরী ঝরে পড়লো আশীর্বাদের মতো আমার মাথায়। কাঁচমন্দিরে এসে মঞ্জরীটিকে রেখে দিলাম সোপানে। মন্দিরে জড়ো হয়েছি সমস্ত শান্তিনকেতন, শ্রীনিকেতন, আশেপাশের গ্রামবাসী, ভুবনডাঙা, গোয়ালপাড়া, স্কুলের অনেকেই। মন্দিরের ভেতর ভরে গেছে, ভরে গেছে চারদিকঘেরা সোপানবলী, বাহিরের আঙিনা উপচে থই থই। সেই জনসমুদ্র চেয়ে আছে উন্মুখমন, উত্তোলিতনয়ন।

এলেন রবীন্দ্রনাথ, রাজবদুন্নত শালপ্রাংশুদেহ ঈষৎন্যুব্জ, তবু ধরতে দেননি কাউকে তার হাত। পদক্ষেপ দ্রুত। কবি পরেছেন ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর, রেশমী গরদ, হালকা চাঁপার আভা, জন্মদিন সাজ।

রবীন্দ্রনাথ আর গানের দলের মাঝখানে আজকের আলপনাটি বড়ো আদরে, বড়ো যত্নে আঁকা। আজ নববর্ষ, জন্মদিন আজ। মন্ত্রপাঠ হলো। প্রভাতীসুর বাজল এস্রাজে। আমরা গাইলাম ছয় মাত্রার ছন্দে দাদরায় ঃ

"আঁধার রজনী পোহালো, জগৎ পূরিল পুলকে
বিমল প্রভাতকিরণে মিলিল দ্যুলোক-ভূলোকে।"

গাইলাম পঞ্চমাত্রিক ছন্দে, ভৈরবীতে

"হেরি তব বিমল মুখভাতি
দূর হোলো গহন দুখরাতি।"

আর তেওড়াতালে সাতমাত্রায় উৎফুল্লকণ্ঠে :

ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে
ধ্বনিল আহ্বান, মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর মাঝে।
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তি সংগীত বাজে॥

সেদিন রবীন্দ্রনাথের উপাসনার ভাষণে লেগেছিল দুশ্চিন্তার সুর ; যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ :

শান্তিনিকেতনে আমি তোমাদের সকলকে আহ্বান করেছি প্রকৃতির সংগে আনন্দে যোগ দিতে আর মানুষের সংগে মানুষের হৃদয়-মন-শুভবুদ্ধির যোগদানে। যদিও জানি, যেখানে বহুলোককে নিয়ে সৃষ্টি, সেখানে সৃষ্টিকাজের বিশুদ্ধতা রাখা সম্ভব হয় না। এইটুকুমাত্র আশা করব ভবিষ্যতে প্রাণহীন, দলীয় নিয়মজালে এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না।

যদিও জন্মদিন, তবু মৃত্যুচিন্তা তাঁকে আলোর পিছনের স্থির-নিশ্চিত অন্ধকারের মতই ব্যাপ্ত করে থাকত ইদানীং। অনেক মৃত্যু ঘটে গেছে পারিবারিক এবং আশ্রমিক। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী দিনগুলিতে শান্তিনিকেতন কী রূপ নেবে, অগ্রসর হবে কি হতে পারবে না, এইসব চিন্তার আকুলতা, অন্তরে আবেগান্বিত হতো, বোধকরি সময়ের অনেকখানি অংশ জুড়ে।

ছোট একটি ব্রহ্মচর্য আশ্রমরূপে পাঁচটি মাত্র ছাত্রের সহযোগে সুরু আশ্রমবিদ্যালয়, সময়ের স্রোতে বহে এসে বিশ্বভারতী রূপে দেখা দিয়েছে। অনেক ঘটনা, অনেক সংঘাত, অনেক নিন্দা, অনেক মিত্রতার মধ্য দিয়ে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বর্তমানকেও অবজ্ঞা করেননি, শ্রদ্ধা রেখেছেন অতীতকালেও। সময়ের যা কিছু শুভ,

যা কিছু কল্যাণকর, নিচ্ছেন গ্রথিত করে—অথচ ভেসে যাচ্ছেন হালছাড়া হয়ে যা কিছু ঘটে যাচ্ছে তারি স্রোতে।

ভাবতে অবাক লাগে—বাঙলার এই গ্রাম্য পল্লীটি, পূর্ববাংলা বা উত্তরবাঙলার গ্রামের মতও নয়, অনেকখানি নির্জনতা, নীরবতা, যেন পুরো গ্রাম হয়েও উঠতে পারেনি, শহর থেকে অনেক দূরে—কিন্তু, সময় থেকে পিছিয়ে পড়া নয়। বোলপুর, সুরুল, গোয়ালপাড়া গ্রামের মাঝখানকার এই গ্রাম্যজমিটুকুই বুকে ধরে রেখেছে বিশশতকের প্রথম অর্ধশতকের বিশ্বকে। শুধু পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, কলাভবন, সংগীতভবন, শ্রীনিকেতন নয়, আছে হিন্দীভবন, চীনাভবন। থেকে গেছেন পিয়ার্সন, আচার্য সিলভা লেঁভী, এলম্‌হার্ষ্ট, জীবন ব্যায়িত করলেন এনড্রুজ। আমার সৌভাগ্য আমি সেই সময়েই গিয়েছি যখন ছাত্রছাত্রীরা এসেছিলেন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ থেকে তো বটেই।

পন্‌জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বংগ এবং অসমীয়া, মণিপুরী, সিংহলীজ এবং চীন এবং জাপানেরও। আমাদের শ্রীভবনের অধিনায়িকা ছিলেন ফরাসী মহিলা আর সহ-অধিনায়িকা জয়ন্তী পন্থ, পর্বতকন্যা হিমালয়বাসিনী। আজকের দিনের হিমাচলকন্যা।

ভাবতে অবাক লাগত এই নির্বাচন—খোলা প্রকৃতির কোলে, শিল্পকলায় সমৃদ্ধ, মননে ঐশ্বর্যময়, সুরের ধারায় সিক্ত শান্তিনিকেতন আমাদের চিত্তের মাঝখানে সত্যই একটি প্রীতিময় হার্দ্য বিশ্বচেতনার বীজ রোপণে সহায়তা দিয়ে চলেছিল। বাঙলা-সাহিত্যে অগাধ প্রেম, বাঙলা দেশে গভীর প্রীতি থাকলেও খুব সংকীর্ণরূপে বাঙালী আমি হইনি। আমার অবাঙ্গালী বন্ধুগুলির প্রীতি আজো স্মরণকে প্রীতিময় করে তোলে।

রবীন্দ্রপরবর্তী শান্তিনিকেতন কি আরো বিকশিত হবে? বিশ্বভারতীর বিশ্বকে করবে প্রতিদিন একটু একটু করে উন্মোচিত না দলীয় নিয়মজালে জড়াবে প্রাণহীন শৃঙ্খলে; এমন চিন্তা মথিত

করছিল নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, অনেক বাদ-প্রতিবাদ, মতানৈক্য, পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থলে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টিধর পার্সোন্যালিটি, অনেক বিরোধের মধ্যকার মিলন।

জন্মদিনের ভাষণে বেজে উঠল প্রাণের অবরুদ্ধ চিন্তন। বোধকরি, তাই তিনি অন্তর্নিহিত ইচ্ছাখানিকে প্রসারিত করতে চাইলেন তাঁদেরি কাছে। যাঁরা তাঁর জীবনকালের শরিক। যারা তাঁর আহ্বানে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গেই যাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন হৃদয়মন বুদ্ধির শুভসহযোগ। তার মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, কর্মীদল সকলের প্রতিই ছিল এই আহ্বান। যার মূল্য আমরা অনেকেই দিয়ে উঠতে পারিনি পরবর্তী জীবনে।

তাছাড়াও আমার মনে হয়, শিল্পকলা বা কাব্য-সাহিত্য, সঙ্গীতের মতই কর্মের উদ্ভাবন শক্তিটি সৃজনশিল্পের অঙ্গীভূত। সেই ক্ষমতাটি থাকে প্রতিভাবান কর্মীর চিত্তে ও চিন্তায়। তাঁর প্রদত্ত বীজ থেকেই জন্ম নেয় বৃক্ষ। সাধারণ মানুষ আমরা সেই গাছ, তরুলতা, ফুল, ফল পেলে বাগান সাজাতে পারি, জল দিয়ে বাড়াতে পারি, আগাছা দিতে পারি নিড়িয়ে, পথে নুড়ি সাজিয়ে, কেয়ারি বানিয়ে মাঝখানে ফোয়ারা—এবং এগুলিও অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু তবু, বৃক্ষসৃষ্টি করতে পারিনে। আমাদের হাতে সংস্করণ সম্ভব, সম্ভব নয় নতুন সৃষ্টি।

আর এই থেমে যাওয়ায় ছিল রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম বেদনা। শান্তিনিকেতন যেন থেমে না যায়, যেখানে আছে সেখান থেকে আরো বিস্তারিত হোক্, গতিময় হোক্। কিন্তু যেন সংগীতময় আর শুভবুদ্ধির হৃদয়মন দ্বারা সামঞ্জস্যের পরিণতি আনতে পারে—বোধকরি এই ছিল তাঁর অন্তর-উচ্চারণ। যৎ ভদ্রং তন্ন আসুব।

মন্দিরশেষে সকলেরই প্রথম প্রণাম গুরুদেবকে। তারপর প্রণাম-আশীর্বাদ, পরস্পর নমস্কারের পালা চলল বেশ কিছুক্ষণ। আম্রকুঞ্জে শালপাতা বিছিয়ে জলযোগ। সামান্য আয়োজন, সমবেত-সমাবেশে অসামান্য।

রাত্রে উৎসব কোনো মঞ্চে নয়, সিংহসদন মঞ্চ, এমনকি লাইব্রেরী-বারান্দাতেও নয়, একেবারে খোলা জায়গায়। যতদূর মনে পড়ে আম্রকুঞ্জেই। ঝক্‌ঝকে নিকোনো মাটি, মস্ত আলপনা, ফুলপাতাচিত্রিত কলস, কলাভবন ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের প্রণাম। রবীন্দ্রনাথ বসেছেন কেদারায়, স্বকণ্ঠে পড়বেন অরূপরতন নাটিকা।

এখানে মনে পড়ল একটি কথা, বলে নিই, নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরে দেখেছি বহুরূপীর "রক্তকরবী", যক্ষপুরী এবং পাত্রপাত্রীদের আধুনিক রূপদানেও চমৎকার। "রাজা অয়েদি পাউস"-মুগ্ধ, পরদিনই গিয়েছিলাম "রাজা" দেখতে। ফিরেছি বিষণ্ণচিত্তে। রবীন্দ্রনাথের সুরঙ্গমা তো এ নয়। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে করিয়েছি "অরূপরতন।" সুদর্শনা : যে চোখের আলোয় দেখার আলোয় জেনে নিতে চায় জীবনস্বরূপ ; বুদ্ধি যার সহায়, তাকে সাজিয়েছিলাম : আগুনরঙা শাড়ী, লাল চেলি, চুল ঘাড়ের কাছে এলো করে বাঁধা, কপালে দু'চারটি অনন্নুশাসিত এলোমেলো চূর্ণ-অলক। বুদ্ধি তার, বাসনা তার, প্রাণের আবেগে দীপ্ত। দুঃসাহসী সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। সুরঙ্গমা : নীলশাড়ী তার পরনে, ঘননীল প্রায় কৃষ্ণ চেলি, চুড়ো করে বাঁধা চুল। সংযত সমস্ত বাসনা, সে ডুবেছে গভীরতায়। আর সেই চুলের শিখরে একটি শাদা চন্দ্রমল্লিকা। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত সুদর্শনাই জয়ী।

তার তীব্র প্রাণের আগুন, জ্বলে জ্বলে : প্রেম
পাথরের মতো কঠিন নিষ্ঠুর জীবনস্বরূপ, ঘষে ঘষে : প্রজ্ঞা।

অরূপরতনকে আমি এইভাবেই জেনেছি।

গুরুদেব পড়ে চলেছেন নাটিকা। গানের দল গাইছে গান। নাচের দল নেচে যাচ্ছে। অরূপরতনেই আছে আমার প্রাণ জুড়োনো সেই গান দু'টি ;

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,

সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।

দুই ধৈবত শুদ্ধ ধ আর কোমল দ, আর তিন নিখাদের ব্যবহারে কোমল ণ, অনুকোমল ণ আর শুদ্ধ ন-তে মিলে গানটিতে এসেছে এক আকুলতা।

আর একটি গান ঃ

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।

তিনদিন পরেই যাত্রা। কলকাতা হয়ে কালিম্পং যাবেন। একান্তে পরামর্শ করলাম আমি, মলিক্জী। মলিক্জীর উপদেশ : শুভ অবসর হেলায় হারিয়ো না। যখন আগেই পাঠিয়েছো তাঁকে কবিতায় প্রণাম, তিনিও পাঠিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ, কেন জানাবে না, সেই তুমি আর এই তুমি অন্য নও, এক।

সংকোচে জানাই, একান্তই ব্যক্তিগত, personal যা। আমার এতই মূল্যবান সম্পদ আড়ালে ঢেকে রাখলেও চল্‌ত। তবু মানুষের মন :

মাঝে মাঝে ঝাঁপি খুলে ঐশ্বর্য দেখাতে ভালোবাসে।

দূর থেকেই তুবার পাঠিয়েছি পঁচিশে বৈশাখের প্রণাম, কবিতার খাতা। তুবারই পেয়েছি আশীর্বাদ-বহন-করা তাঁর চিঠি।

নরম কালো মখমল মলাট, নীলপাতা, ঘনকালো কালির আখর, এ ছিল আমার সেই বয়সের আনন্দ। উৎসর্গ পত্রে লিখলাম :

গুরুদেব,

দূরের প্রণাম আরো কাছের প্রণাম
এইবার দিলাম এক করে।

বৈশাখের দ্বিতীয় দিন। একলা চলেছি উত্তরায়ণ। কাউকে করিনি সঙ্গী বা সঙ্গিনী। আঁচল-আড়ালে লুকোনো খাতা। নির্জন সময় খুঁজে নিয়েই এসেছি।

প্রণামান্তে হাতে তুলে দিয়েছি খাতা। খুললেন, পড়লেন তু'একটি কবিতা পাতা উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে। হঠাৎ চোখের চাহনিতে চেনা, খুশির আমেজ গলায় :

"তোমার লেখা আগেই পড়েছি, আশীর্বাদও জানিয়েছি তোমাকে।"

তারপর আমার পিঠে তাঁর সুপ্রসন্ন দক্ষিণ হাত।

বললেন :

"কোনোদিনো বাজে লিখবে না তুমি।"

রবীন্দ্রনাথ গেছেন পাহাড়-ভ্রমণে, তাই বলে থেমে নেই শান্তিনিকেতন, চলছে। চলছে সকাল-সন্ধ্যা উপাসনা। বুধবার মন্দির উপাসনার পর ছুটির হাওয়া গায়ে লাগানো। ভ্রমণ, গুরুপল্লীর এবাড়ী ও-বাড়ী হানা। মুখের স্বাদ বদলানো কিছু, কিছু বা বাড়ীর স্বাদ-আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষা।

কাজের দিনে উপাসনা, জলযোগ সেরেই ক্লাশ। ছাত্রছাত্রী চলেছে সংগীত ভবন ঃ

বিষ্ণুপুরী ঘরাণীর হিন্দী বাঙ্‌লা গান। সেনী ঘরাণীর শিষ্যবংশ দলের রেওয়াজ একদিন যে গায়কী প্রাণবন্ত ছিল বাঙলায়। গুরুদেবের গানে আছে যার ধ্রুপদী ভঙ্গীর প্রভাব। ওস্তাদ ওয়াজুল ওয়ারের ভাত খণ্ডের ক্রমানুসার। হাসিখুশি অথচ ধীর শান্ত-গম্ভীর মানুষটির নির্দেশ, জরা ধীরেসে। ওঁর কাছেই শিখেছিলোম প্রথম গান ইমনে। "পিয়াকি নজরীয়াঁ জাদুভরি।" এস্রাজের ক্লাশ অশেষ :বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেতারে মগ্ন সুশীলদা। শিশিরদার বেহালায় ছড়ের টান অনেকক্ষণ—গুরুদেবের গান শান্তিদার উৎফুল্ল উচ্চকণ্ঠে, দু'চোখে মুদিত মৃদু রবীন্দ্র-সংগীত শৈলজাদার ; বন্ধদুয়ার ঘর ঃ কেলুনায়ারের কথাকলি, মণিপুরী শিক্ষকের মৃদংগের বোল ঃ তা তা থৈ থৈ, তা থৈ তা থৈ।

কলাভবনে মোটা লেন্‌সের চশমা চোখে বিনোদদা, শুনেছি পাওয়ার চোদ্দ, ওদিকে রামকিংকর বেইজ, বিনায়ক মাসোজী। গৌরীদি, যমুনাদি, বিশুদা। সর্বোপরি সমস্ত ছাত্রছাত্রীর তদারকে মাষ্টারমশাই। প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও ঘুরে যাচ্ছেন। কাউকে দেখিয়ে দিচ্ছেন তুলি ধরা, কাউকে বারণ করছেন সহজ উপায় অবলম্বনে। কঠিনই সাধ্য।

ফ্রান্সে র‍্যাঁদা তাঁর ছাত্রদের ইনটারভিউতে প্রথমেই বলতেন, "পাথরটা গড়িয়ে আনো।"

সিংহসদনসমুখ, লাইব্রেরী প্রাঙ্গণ, বারান্দা, আম্রকুঞ্জ, ছাত্রছাত্রী ভাগে ভাগে, পাঠভবন, শিক্ষাভবন। বিজ্ঞানের ক্লাশ অবশ্য বসত ঘরেই। গ্রন্থাগার দোতলায় বলাকার ক্লাশ ক্ষিতিমোহন সেনের। পাঠদানরত সর্বশ্রী :

ফণীন্দ্র অধিকারি, ক্ষিতিমোহন সেন, মলিকজী, প্রভাতদা, অনিলদা, বাণীদা অর্থাৎ ক্ষিতিশ রায়, নির্মলদা, উপীনদা, মশায়, মিস্ সাইক্স, বাজপেয়ীজী, দ্বিবেদীজী, অধ্যাপক তান।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা। খাওয়া, রেষ্ট পীরিয়ড, ষ্টাডি আওয়ার, আবার ক্লাশ। ঝাঁ ঝাঁ করে শান্তিনিকেতনের সাঁওতালী রোদ্দুর। মাঝে মাঝেই অফ্ পীরিয়ডে লাইব্রেরী। সারিসারি সাজানো বইগুলির মনমাতানো গন্ধ টানত আমাকে। হাজার হাজার বছরের থমকানো সময়গুলির স্বাদগন্ধ এসে যাবে আমার হাতের অঞ্জলিতে। কোনো কোনো জলাধার মনের মতো লাগলে তাতে ডুবিয়ে অবগাহনে দেব ডুব। এমনি একটি লাইব্রেরীর স্বপ্ন দেখেছি কতকাল। বহুদেশ, বহুকাল, বহু কৌতুকীমন, ঋদ্ধিবান চিত্ত, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, সংবেদনী হৃদয় আর তার মাঝখানে আমি, বিপন্ন, বিভ্রান্ত নয়, পুলকিত আনন্দ-বিস্ময়। যে আমি অতীতের, বর্তমানের যে আমি আর যে আমি রেখে যাব ভবিষ্যতের একটুকুরো বীজঅন্তর্গত প্রাণ। স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ।

লাইব্রেরীতে প্রভাতদা (রবীন্দ্র জীবনীকার) সত্যদা (কণিকার পিতা) হাসিমুখ, কৌতুককণ্ঠ ;

—ক্লাশ পালিয়েছ বুঝি ?

উঁচু জানালায় মগ্ন হয়ে বসে ক্লাশ পালিয়েছি বটে, পরের পীরিয়ড মনেই পড়েনি।

ছুটির ঘণ্টা বাজল। জলযোগ, খেলা, সন্ধ্যার সুরু। কোনোদিন সাহিত্য সভা, শিশুবিভাগ, পাঠভবন, হিন্দীভবন বা সাহিত্যিকার।

কোনোদিন আলোচনা বা তর্কসভা। নামী কারুর উপদেশ বা ভাষণ শোনা কোনোদিন। খাবার ঘণ্টা বাজে। রান্নাবাড়ী শেষে উপাসনা। রেষ্ট আওয়ার, ষ্টাডি—আলো নিভে অন্ধকার। চলছে সব ঠিক্। যেন ঘড়ি চলেছে দম লাগিয়ে টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

তবু যেন সেতারের জুড়ী-তার আলগা। শান্তিনিকেন চলেছে, অথচ নেই রবীন্দ্র-উপস্থিতি। কাঁপন লাগেনা জুড়ী তারে, দুটো তারের মিলন ভগ্ন।

কিছুদিন পরেই গরমের ছুটি। কলকাতা। মা-বাবা, আত্মীয়, আপনজন, আনন্দ, আনন্দ। তবু ত্রয়ী উচ্চারণ হলো না, বলতে পারলাম না আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। মনের অনেকখানি জুড়ে বসে আছে ফেলে আসা আর এক আপন শান্তিনিকেতন। বিষণ্ণতার রেশ তাই আছেই।

ইতিমধ্যেই আত্মীয়জনের একটু আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছি। আমার গানের ভঙ্গী নাকি গেছে বদলে। কুন্তলা মাসিমার আমার ওপর অগাধ ভালোবাসা, অনেকটাই অকারণে। গান শুনে খুব খুশি, বললেন, "এই কদিনেই তুমি শান্তিনিকেতনের কাজটি গলায় আদায় করে এনেছো।"

ছুটি শেষ হলো। জুলাইয়ের প্রথম দিনের ক্লাশ শুরু হবে। আগের দিন ফিরেছি। শ্রীভবন জমজমাট। আবার জনগণমন ভারত, সব প্রদেশের মেয়েরা সব প্রদেশের মায়েদের দেওয়া খাবার মেয়েদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাচ্ছি। মনে পড়ছে অন্যদিনের কথা। একবার মা পাঠালেন পার্শ্বেলে কিছু খাবার। ক্লাস সেরে আসতে মেয়েরা সংবাদ দিল, খালি টিনটা দেখালো, বললো খুব চমৎকার খেতে, আমরা খেয়ে ফেলেছি। আমাদেরও পার্শ্বেল এসেছে, তুই খেয়ে দেখ।

দুদিন যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ ফিরলেন জুলাইয়ের তিন তারিখে। অমনি যেন সেতারে জুড়ীতারে কাঁপন লাগল। ঝনঝন ঝংকারে ঝংকারে পুলকিত আমরা শুনলাম আকাশবাণী ঃ

"গুরুদেব আমাদের বাঙলার ক্লাশ নেবেন।"

অপরাহ্নের আগেই আমাদের উত্তরায়ণ—অভিমুখ হবার আকুলতা। রান্নাবাড়ী বাঁয়ে, ছাতিমতলা ডাইনে, জলাধার ছাড়িয়ে, বেশ কিছুটা রঙীণ পথ। উত্তরায়ণ ফটক পার হয়ে কাঁকর বিছানো লাল প্রশস্ত আঙ্গিণায় পায়ের শব্দ তুলে আমরা সমবেত। বাগান মালঞ্চ, উঁচুনিচু ঘর পুনশ্চ, শ্যামলী, সমুখে পূবমুখে উদিচী। ছোট্ট দোতলা বাড়ী, উপরে একটি ঘর, নিচেও একটি, দুপুরের রোদ্দ্রে দাঁড়িয়ে জ্বল্‌জ্বলিয়ে জ্বলছে। নিরাভরণ সেই ঘরটি। নিরাভরণ সেই ঘরে মাটিতে সতরঞ্চ বিছিয়ে গুরুদেবের ক্লাশ। আশ্চর্য সেই ক্লাসটি। আমাদের মত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে বসে আছেন, ক্ষিতিমোহন সেন, অনিলদা, রাণীদি মাষ্টারমশাই, সুধাময়ীদি আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা। তপোবন প্রবন্ধটি একদিন পড়ালেন, সেই তপোবন পৌরাণিক নয়, কবির সৃষ্টি। তা শুধু অতীতবহ মৃতকাল নয়, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও প্রসারিত। "মানসী কাব্যের ভূমিকা" যখন পড়াতেন, মানসী রচনার যুবক রবীন্দ্রনাথ ফুটে উঠতেন চোখের সমুখে, জুড়ে থাকতেন মনের গভীরে।

পরীক্ষা পাশ প্রশ্নে চিত্ত যাদের উতলা, তাদের কথা জানিনে। আমার মনে লাগত ঃ নতুন সৃষ্টি।

সাজছে তার গুরুদেবের প্রিয় রঙ বাসন্তী রঙে, জাফরাণী রঙে। শাড়ী, ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর, পাজামা, কুর্তা, শেরওয়াণী, রঙে রঙীণ, আজ বসন্ত। এদিকে দোল উৎসব নয়, মাস নয় ফাল্গুন, ঘনঘোর বর্ষা।

১৩৪৭ এর বাইশ শ্রাবন, ১৯৪০ এর ৭ই আগষ্ট, অক্সফোর্ডের ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি প্রদানে প্রতিনিধিস্বরূপ আসছেন: ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি, স্যর মরিস্ গোয়ার, আসছেন দার্শনিক-প্রবর স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্।

বুধবার। মন্দিরে আচার্য গুরুদেব। উপাসনার ভাষণে বেদনা বেজে উঠল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের। হানাহানি বহুদেশের অস্ত্র, মেদ, অস্থি-মাংস চূর্ণচূর্ণ করবার সঙ্গেই বিদীর্ণ করছিল কবির বক্ষ, যেহেতু রবীন্দ্র-চেতনায় যথার্থই ছিল বিশ্বচেতনার গূঢ় অভিব্যক্তি। তবু মানুষ রবীন্দ্রনাথ, মানবধর্মে বিশ্বাসী, শেষপর্যন্ত ভাবেননি, যুদ্ধেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবসান। ভাঙন যত ভয়ঙ্কর হোক্, আশা তাঁর পূর্ণতার।

জয় পূর্ণ মানবের। জয় নব অরুণোদয়।

মন্দির থেকে সিংহসদন। দুয়ারে মঙ্গলকলস, আলপনা। সজ্জিত মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, স্যর মরিস গোয়ার, স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্, সম্মানিত অতিথিরূপে সর্বশ্রী:

অপূর্ব চন্দ, সুশোভন সরকার, অমিয় চক্রবর্ত্তী, শাহেদ সুরাবর্দী, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ বটম্‌লি, হাইকোর্ট জজ মিঃ হেন্‌ডারসন্ সকলেই প্রাক্তন অক্সফোর্ড স্নাতক।

গানের দল গান ধরল:

বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল, আজহে।
বরপুত্র সংঘ বিরাজ হে॥

মরিস্ গোয়ার মানপত্র পড়লেন লাতিনে। ভাষা বুঝি নি তার। শব্দধ্বনি মগ্ন করে রেখেছিল আপন অন্তর্নিহিত সুরঝঙ্কারে। অনেকদিন পরে এমনি হয়েছিল কলকাতায় এক কবি সম্মেলনে। জার্মান কবিকণ্ঠে প্রাচীন জার্মাণ গাথা সোনোরাস, বীরোদাত্ত, সংস্কৃত-সহোদর যেন। সেদিনো ভাষা বুঝিনি তার। শুধু মনে লেগেছিল, শব্দ আপনার ভেতরকার সুরে ধ্বনিদ্বারাই সংগীতের পাশাপাশি।

রবীন্দ্রনাথ প্রতি উত্তর নিলেন সংস্কৃতে। সুরেলা সেই গলার ধ্বনি যে শোনেনি সংস্কৃত ভাষার ছন্দ সুরের মিলনে, সে জানবে না কী তার রয়ে গেল জানার অগোচর।

দুটি ভাষণই শেষ পর্যন্ত ইংরাজীতে রূপান্তরিত। অর্থ বোধগম্য। কিন্তু, আর খুঁজে পেলাম না সেই পুরাতন সঙ্গীত দুটি। স্যর মরিস্ গোয়ার বলেছিলেন :

"the university whose representative I am, has in honouring you, done honour to itself."

আরোও বলেছিলেন : শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী, আমি তোমাদের সৌভাগ্যে আশ্চর্যান্বিত। পশ্চিমজগতে এতবড় প্রতিভাধরের এতকাছে আসতে পারা, শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত।

ঠিক্ বলতে পারব না উক্ত কিনা এই কথা কটিই। মরিস্ গোয়ারের পুরোভাষণ নেই হাতের কাছে। স্মরণের ঝাঁপিতে যা ভরেছি আর যা বার করলাম আটতিরিশ বছর বাদে, তার ত্রুটি সুধীজনকাছে ক্ষমার্হ।

* * *

সন্ধ্যায় ভীষণ বৃষ্টি। ঝরোঝরো ঝরিছে বারিধারা। পথনির্জন হবারই কথা, তবু অতিথি সমাগমে পরিপূর্ণ সিংহসদন হল। নৃত্যনাট্য অভিনয় : শাপমোচন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম থীম, যা রাজায়, অরূপরতনে, তাই শাপমোচনে। বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন, আর ছিল

না বৌদ্ধ। সমস্ত স্থান থেকেই আহরণদক্ষ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন আত্মীয়করণে। শেক্সপীয়র যেমন প্রাচীন কাহিনী থেকে নিতেন তাঁর কাহিনী, গল্প, নাম, পর্যন্ত রেখে দিতেন, তবু তা হয়ে যেত সেকস্পীয়রের নিজের কাহিনী, তেমনি আপন জারক রসে জারিয়ে করে তুলতেন রবীন্দ্রনাথীয়।

এস্থেটিক্সের আলোয় আলোকিত নন্দিত অতিথিবর্গ সেই সন্ধ্যায় সিংহসদনে বসে বসে দেখলেনঃ অসুন্দরের পরম ব্যথায় সুন্দরের আহ্বান। সিংহসদনের বাইরে ঝরছে ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো।

হায়রে, সেদিন কে জানত উৎসব আন্দ-মুখর ঝর্ঝর এই দিনটিই হয়ে যাবে শান্তিনিকেতনের রোদন পারাবার।

প্রথম বর্ষামঙ্গল দেখা ছায়া প্রেক্ষাগৃহে। প্রথম দেখা রবীন্দ্রনাথ। প্রথম শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীতে শান্তিনিকেতনবাসী কণ্ঠে। মনিকা দেশাই, শ্রীমতী ঠাকুরের নাচ। শান্তিদার বলিষ্ঠ পুরুষালি নাচ প্রথম শোনা রবীন্দ্র আবৃত্তির সঙ্গে।

এবার বর্ষামঙ্গল শান্তিনিকেতনে। বর্ষার গানের শিক্ষা চলছে সঙ্গীতের ক্লাশে, বর্ষামঙ্গল আয়োজন। এবার নতুন গান নেই—আগের আগের বছরের গান থেকেই নির্বাচন। ১৮ ভাদ্র হবে উৎসব। হঠাৎ খবর এলো গুরুদেব নতুন গান দেবেন। ঠিক্ মনে নেই ষোলো কিম্বা সতেরো, শান্তিদার অধিনায়কত্বে সমবেত আমরা। রবীন্দ্রতথ্য ও তত্ত্ব ভাণ্ডারী প্রভাতদার মতে রচনাদিন ভাদ্র ষোলো। রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিখলাম সে বছরের একমাত্র বর্ষাসঙ্গীত ঃ

"এসো এসো ওগো শ্যামছায়া ঘনদিন।"

কানে কম শুনছেন তখন তবু আমাদের কণ্ঠের ত্রুটি কান এড়াল না, বললেন, ঠিক্ শ্রুতিতে পৌঁছাল না স্বর। চির-অতৃপ্তচিত্ত বললেন, একটু আরো বদল করি।

শান্তিদা বললেন ঃ গুরুদেব সুরটি যে খুব সুন্দর হয়েছে।

* * *

শান্তিনিকেতনে উৎসব সকলি, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব, পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব শুধু বর্ষাই মঙ্গল। যেহেতু বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে জল, জলেই অন্ন, ওষধি ও জীবকুলের জন্ম। বর্ষার বর্ষণেই জন্ম, লালন, বৃদ্ধি। উদ্ভিদজগত, জীবজগৎ ও মানব বিল্বমঙ্গল।

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গলের ভাগ তিন। হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল সান্ধ্য আসর। তিনে মিলে এক।

প্রথম বর্ষামঙ্গল হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় বাংলা ১৩২৮ এর

১৭।১৮ ভাদ্র। প্রভাতদা তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে এই বর্ষামঙ্গলের উল্লেখ করেছেন, বাংলার চারুকলার ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা বলে। প্রথম সেই বর্ষামঙ্গল উৎসবে নাচ ছিলনা যা আজকের দিনে বোধকরি ভাবতে পারবে না কেউ। কবি "কল্পনা" থেকে আবৃত্তি করেছিলেন কয়েকটি বর্ষার কবিতা। আর গান গাইলেন সেদিনের গানের দল।

শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষামঙ্গল উৎসব, তার পরের বছর বাইশে শ্রাবণ, ১৯২২ এর ৭ই আগষ্ট। সেদিন পূর্ণিমা। অথচ বৃষ্টির ধারা ঝরোঝরো ধারে ঝরেছিল অবিরাম, আর গুরুদেব নিজে গেয়েছিলেন প্রকৃতির ধারাবর্ষণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঃ

আজ আকাশের মনের কথা ঝরোঝরো বাজে।

প্রথম বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব হলো প্রথম বর্ষামঙ্গলের প্রায় ছয়সাত বছর পরে ১৯২৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্‌লার ১৩৩৫ সালে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুধাবন করেন মানবজগতের, জীবজগতের মঙ্গলে বৃক্ষের সহযোগ। বনমহোৎসবের কথা তখনো কেউ ভাবেন-নি। দেশজুড়ে তা সুরু হয়েছে রবীন্দ্র-অনুপ্রেরণাতেই। হলকর্ষণ উৎসব শ্রীনিকেতনের আপন উৎসব। এই উৎসবটিকে মাষ্টারমশায় স্মরণীয় করে ধরে রাখলেন ভিত্তিচিত্তে অর্থাৎ ফ্রেস্কোতে। খোলা আকাশের তলে মস্ত পাঁচিলের গায়ে আঁকা হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেস্কো। বিশশতকের অজন্তা। যাঁরা নন্দলাল বসুর ছবির এ্যালবাম্ দেখেছেন, বিশ্বভারতী প্রকাশন, মলাটে কিছু আভাস পেয়েছেন।

সেবার বৃক্ষরোপণেই আগেই বোধকরি হোলো হলকর্ষণ। সমস্ত গ্রামবাসীর সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মীবৃন্দ। বেশ কিছু সাঁওতাল নারী পুরুষও ছিলেন। পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, মেয়েরা চুলটি আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে তাতে গুঁজেছে ফুল, বেশীর ভাগ লাল, কালো রঙে লাল ফুল, দেখাচ্ছে সুন্দর।

বিরাট শস্য-আল্পনা, চাল, ডাল, ধান, গম, কালোজিরে রঙে রঙীন। পাশে পাশে রাখা সবুজ-শাক সব্জি, আনাজ-তরকারি। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীমশায় কৃষি-প্রশস্তি পাঠ করলেন প্রাচীন বৈদিক স্তোত্র থেকে। এদিকে সাজানো দুই বলিষ্ঠ বলদ, হাল কাঁধে চড়ানো, গুরুদেব হলচালনা করলেন স্বয়ং। জাফরাণী রঙে ছোপানো রঙীন ধুতি পরে, সেজেগুজে চাষী বালকেরা গান ধরল ঃ

আমরা চাষ করি আনন্দে।

বৃক্ষ রোপণ প্রাতে, গানের আসর রাতে।

বৃক্ষ মানুষের পায়ের ধ্বনি শোনবার আশায় ছিল কান পেতে। ঐ যে আসে, আসে, আসে। প্রাণের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ হয়না তার শাখার আন্দোলনে, পাতার মৃদু মর্মরে। প্রাণ চায়, শব্দ, ভাষা, বাক্য, বাণী, কাব্য, প্রাণ চায় সুর, সংগীত। প্রাণ চায় পূর্ণ মানবতার অভিযান। সুন্দরের, কল্যাণের, মঙ্গলের। প্রাণ চায়, বড়ো কঠিন, বড়ো দুঃসহ গুরুভারেই মানুষ জয়ী হোক্। বৃক্ষের মধ্যেকার আদিতম প্রাণ তাই প্রতীক্ষা করে আছে মানুষের মধ্যেকার সুন্দরতম প্রাণের জন্য।

মানুষ জানে, গুরুভার তার ব্রতের প্রথম সহায়ক সূর্যবন্ধু বৃক্ষ, সে দিয়েছে অন্ন, সূর্যালোককে ধরে আপন পত্রপল্লবে সে করেছে

আহরণ, করেছে সঞ্চয় চিরসবুজ, চিরনূতনকে, সূর্যালোকদীপ্তদিনে টেনে নিয়ে দূষিত বায়ুসমূহ দিয়েছে ছাড়িয়ে মানুষের বুকজুড়োনো পবিত্র বাতাস।

আর ডেকে উধাও মেঘকে শাখা প্রশাখার আন্দোলনে নাবিয়েছে, ঝরিয়েছে ঝরোঝরো বর্ষণ। মানুষও অকৃতজ্ঞ নয়, তাই সে গাছকে ডেকে বলে—হে আদিতম বন্ধু, এসো তুমি, এসো আমার পাশটিতে। তাই বৃক্ষ রোপণ, বনমহোৎসব।

আঠারো ভাদ্রের সকালে বৃক্ষরোপণ উৎসব রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতেই। গানের দল গান ধরল :

আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল, মানবের স্নেহ সঙ্গনে
চল্ চল্ আমাদের ঘরে চল্।

নাচের দলের মেয়েরা আসছে নাচতে নাচতে, সহজ, সরল, সাজ প্রত্যেকের হাতে চিত্রিত ছোট্ট কলসে বৃক্ষচারা। নাচের পরেই রোপিত। সকালের নাচে ছিল নতুন শিক্ষার্থীরা, সকলের নাম মনে নেই, মনে আছে, গুজরাটের সুশীলা আষাঢ়, মল্লিকজীর ভ্রাতৃষ্পুত্রী কম্‌লা মল্লিক।

রাতের নাচে ছিল নৃত্য-পারদর্শীরা। যতদূর মনে পড়ে মমতা নেচেছিল "শ্রাবণের গগনের গান, বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, ক্ষণে ক্ষণে।" ঘননীলশাড়ী, কৃষ্ণমেঘের কাছাকাছি। দু'কাঁধ বয়ে নেমে এসেছে দু-ধারায় শাদা চাদর—বিদ্যুৎ-প্রতীক। শিশুবিভাগের দল "পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে" গানটির সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি। উৎসাহে গেয়ে চলেছিল ফিরে, ফিরে, ফিরে। শৈলজাদা এস্রাজের ছড়ের মৃদুস্পর্শে তাদের থামালেন।

আমাদের সে বছরের সেই নতুন একমাত্র গানটি, যা চিরকালের জন্য হয়ে গেল শেষতম বর্ষাসংগীত, সেদিন সে কোথায় ছিল সুরু, মাঝখানে অথবা শেষে আজ মনে নেই। পরবর্তীকালে যখনি করেছি বা করিয়েছি বর্ষামঙ্গল ; আমি তাকে রাখি সমাপনেই।

অন্ন, বায়ু, জন্ম, লালন অধ্যায় পার হয়ে প্রেম। বিরহ-মিলন। এবং চিরমিলন আকাঙ্ক্ষায় চিরবিরহ। সম্পূর্ণ মিলন তো হোলনা আজও। কালিদাসের স্খলিত বলয় বিরহী বপ্রক্রীড়ারতগজের মতো দর্শনীয় মেঘকে দেখে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, শরণাপন্ন হোলো ঃ

তপ্তজন শরণ, পয়োদ তুমি শোনো, বার্তা পৌঁছাও প্রিয়াকে
দুঃসহ বেদনার বিরহ গুরুভার কুবের অভিশাপে জানাবে।

(অনুবাদ ঃ লেখিকা)

মেঘমল্লারের সুরে বাজে
তিমির দিন ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কে সে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

মানুষ এবং মানুষীর এই চিরবিরহ বেদনাই মিলনকে অতিক্রম করে গেল। রয়ে গেল মিলনকে বার বার ফিরে ফিরে নূতন করবে বলে, সম্পূর্ণ করবে বলে। তাই বর্ষার সান্ধ্য-আসরে মিলনের চেয়ে বড়ো বিরহ।

অশ্রুভরা বেদনায় বিরহীর বিফল সাধনা।

তবু চিরন্তন নয় বিফল সাধনা। একটু একটু করে সে বিরহকে অতিক্রম করে যাবে এগিয়ে। কবির আহ্বান তাই বারবার।

এসো এসো ওগো শ্যামছায়া ঘন দিন, এসো এসো
আনো আনো তব মল্লার-মন্ত্রিত বীণ্—ইন॥

বর্ষামঙ্গল শেষ করেই রবীন্দ্রনাথ আবার গেছেন পাহাড়ে। আবার শান্তিনিকেতনের তাল ঢিমেতেতালায়। হঠাৎ খবর টেলিফোনে,—গুরুদেব অসুস্থ, অজ্ঞান। শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হয়ে গেলেন সুরেনকরদা, অনিলদা, সুধাকান্তদা, কলকাতা থেকে প্রশান্ত মহলানবীশ।

আমাদের দিন কাটেনা।

ক্লাশ বন্ধ। বসে আছি স্তব্ধ, নতমুখ। ফিরে ফিরে জেনে আসছি খবর। দুঃসহ দিন, দুর্ভর রাত। একটু একটু করে জানছি; ধীরে চলেছেন তিনি আরোগ্যের পথে। আরোগ্য সুরুর সঙ্গেই সুরু নতুন রচনা। সৃষ্টি নেই থেমে।

১৮ নভেম্বর ১৯৪০।

শান্তিনিকেতনের প্রবেশ পথ থেকে উত্তরায়ণ পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে। দুমাসের ব্যবধানে তিনি ফিরছেন। বলিষ্ঠ সবল চেহারা কিছু শীর্ণ, শ্রান্ত ক্লান্ত মুখচ্ছবি। তবু ক্লান্ত হাসিটিতে খুশির ঝিলিক, আষাঢ়ে মেঘের ফাঁকে আলো। তিনি ফিরছেন তাঁর শান্তি-নিকেতনে। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, জাভা, বলিদ্বীপ, আর্জেন্টিনার সানইসিদ্রো, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতার জোড়াসাঁকো, এমনকি হিমালয় হিমবন্ত যেখানেই যান। ফিরে ফিরে আসতে হয় শান্তিনিকেতনে।

এখানেই তাঁর গানের ধুয়ো, প্রাণের আরাম।

আমার জন্মদিন ১৮ অক্টোবর, কার্তিকের প্রথমদিন। সঞ্চিত ছিল জন্মদিনের প্রণাম, নভেম্বরের শেষাশেষি প্রণামান্তে হাতে দিলাম কবিতা নয়, গল্পের খাতা। কিছু তার প্রকাশিত, অপ্রকাশিত কিছু। বললেন: নিজে পড়তে কষ্ট হবে আমার। দুপুরবেলায় চলে

আসবে পড়িয়ে শুনিয়ে যাবে একেকটি গল্প একেকদিন। তারপর লিখে দেব ভূমিকা, পরিচয়ে সুবিধে হবে তোমার।"

কী যে হোল আমার। অনেকদিন উত্তরায়ণ অভিমুখই হইনে। দুপুরের অবকাশটুকুতে হানা, মন বলল, মস্তবড়ো অন্যায়ের সংঘটন ঘটানো, মস্ত অপরাধ।

সেটা ছিল আমার নেহাৎই কিশোরী রোমান্তিকতা, তাকেই মর্যাদা দিয়েছি সেদিন। বৌঠানও বেলেছিলেন ডেকে ঃ

"এসো তুমি, বাবামশায় নতুন লেখা শুনতে ভালোইবাসবেন।"

ডিসেম্বরে চলে আসতে বাধ্য হলাম। জ্বর, বুকে ব্যাথা প্লুরিসি। সেদিন প্লুরিসি শব্দটিও ভীতিপ্রদ ছিল। আমার সব কিছু রয়ে গেল শ্রীভবনে। তাক সাজানো বই, টাঙানো এস্রাজ, সেতার।

প্রণাম সারলাম গুরুদেবকে। পিঠে হাত রাখলেন ঃ —পৌষের মেলায় যোগ দিতে পারলেনা। শীঘ্র সেরে এসো। শান্তিনিকেতনই তোমার ঠিক জায়গা।

সমস্ত প্রণম্যদের প্রণাম, নমস্কার। বুকে একটা ব্যথা। বন্ধুরা দল বেঁধে তুলে দিলো বিশ্বভারতী বাসে। বুকে ব্যথা। আমি ছেড়ে চলেছি আমার শান্তিনিকেতন। তিন মাস পরে ফিরে এলো আমার বই, এস্রাজ, সেতার। আমার ভগ্নহৃদয়। শান্তিনিকেতন নিষিদ্ধ, চিকিৎসার পরেই চেঞ্জ। হাওয়া বদল করতে দেওঘর।

মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনের শালফুলমঞ্জরীর গন্ধ পাই সহপাঠী-পাঠিনীদের চিঠিতে। নববর্ষের প্রণামের জবাবে আশীর্বাদ ঃ গুরুদেব বৌঠান, মাষ্টারমশাই, ক্ষিতিদাদু, মলিকজী, ফণীদাদু, অনিলদা-রাণীদি। আমন্ত্রণলিপি এলো জন্মদিনের অনিলদার কাছ থেকে ঃ

"জানলে অহংকার হবে, গুরুদেব তোমাকেও তাঁর জন্মদিনে ডেকেছেন।"

এবার জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখেই। ২৩শে বৈশাখ লিখে দিয়েছেন জন্মদিনের নতুন গান ঃ

হে নূতন, দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। বারবার মনে হ'তে লাগল, শান্তিদার অধিনায়কত্বে যারা শিখল এই গান, আমার কণ্ঠ বাদ পড়ে গেল তাদের থেকে।

হায়রে আমি, হায়রে আমার দুর্বলতা। হায়রে সেদিনের সেই সাধারণ মেয়েটির অক্ষমতা। আটতিরিশ বছর কেটে গেল, আজো

আমাকে বিদ্ধ করে সূচীমুখ সুতীব্র ব্যথা, নিমন্ত্রণ রক্ষা হয়নি। কোনো ইচ্ছাই হল না পূর্ণ।

শুকনো পাথুরে পথ
ঘুরে ঘুরে ঘুরে
জল গেল হারিয়ে।

দেওঘরেই পড়লাম মিস্ র‍্যাথবোনের উদ্ধত চিঠির পৌরুষের জবাব। এরমধ্যেই আবার সংবাদ গুরুতর পীড়ার। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতা। অপারেশন হবে। হোলো। তার করে চলেছি প্রতিদিন, প্রতিদিন জবাব আসছে তারে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে বুলেটিন পাঠ। শেষ তার আসার আগেই ২৩শে শ্রাবণ, ৮ অক্টোবর কাগজ খুলেই পাতাজোড়া সব ছবি, কলম ভরা লেখা। বিমূঢ়চিত্ত ভেবেই পায়না কেন এত ছবি, এত লেখা ? তারপর সম্বিত ফেরা। বুকের আঁচল ভিজে গেছে অগোচরে।

দেহ নেই—এ যে নাস্তি—চির হাহাকার।

এগারো দিনে শ্রাদ্ধবাসর শান্তিনিকেতনে। আমারো সেই প্রথম শ্রাদ্ধতর্পণ। ফোটো রাখিনি সম্মুখে, উচ্চারণ করিনি "প্রেতায় প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণায় দদামি।"

মন্ত্রোচ্চার :

মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধবীনঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তম উতোষসো,
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধুমান্নো বনস্পতি
মধুমাং অস্তু সূরিয়ঃ (সূর্যঃ)
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ হরি ওঁ।

বাইশ শ্রাবণ

বাইশ শ্রাবণ ; তুমি দেখা দিলে তিনবার, তিনমুখচ্ছবি। তোমার প্রথম মুখ ১৩২৯ এ শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষামঙ্গল। ঝরো ঝরো ধারা, কবির গান : প্রাচীন বেদনা বহে আনা। সেদিনো ৭ আগস্ট, ১৯২২ এর।

দ্বিতীয় মুখ তোমার, উৎসব মুখর আনন্দ। উড়ছে উত্তরীয় বাসন্তী, বলেছিলে হেঁকে—দিন যাই হোক্, আজ বসন্ত। সেদিন সাহিত্য আচার্যরূপে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে বরণ করে গৌরবান্বিত।

১৩৪৭ এর বাইশ শ্রাবণ, সেদিনো ৭ আগস্ট ১৯৪০ এর।

তোমার তৃতীয় মুখ : জানিনা কী ছিল তার।
রাহুর মতন অন্ধ
দিবসের শেষ সূর্য নিরুত্তর
অথবা অক্ষয় স্বর্গের অধিকার।

১৩৪৮ এর বাইশ শ্রাবণ, ৭ আগস্ট ১৯৪১, সূর্য যখন
মধ্যগগণে, রবীন্দ্র-জীবনবিচিত্রের আশ্চর্য ফুলদলে শেষ
গ্রন্থি বেঁধে মালাখানি দিলে ভাসিয়ে।

যদিও তাঁর বিশ্বাস দিনান্তবেলায় শেষের ফসল
তুলে নিয়েছেন তরী পরে, তাঁর বিশ্বাস

"যা কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে দুঃখ সে নয়
নয় সে কামনা।
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে।"

আমরা চোখের জলে ভেসে বললাম :

জানিনা, কোথায় শেষ, সুরু কোন্‌খানে ? তবু
হে অজানা, হে মহাঅজানা :
সমুখে শান্তি-পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার॥

আর কেন? এবার মুড়োলে হয় নটেগাছ, গল্প তো ফুরোলো। তবু ফুরোয়না, শেষ হয়না শেষেও। ঝাঁপি খুললে এখনো অনেক অবাক্।

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি বটবৃক্ষ
ঝড়ে ভাঙ্গা ডাল
ভেঙ্গে পড়া শাখা-প্রশাখা পল্লব বৃন্তচ্যুত
তবু ঝুরি নেমে মাটির গভীরে নেয় রস।
দেয় পাখিদের বাসা পল্লব নিবিড়ে
দীর্ঘ বৃত্তচ্ছায়ে দগ্ধপথিকের তপ্তশ্বাস-মোচন।

আহরণ করেছিলেন নানা দেশকাল থেকেই। যদিও শিকড়ের মূল পিতৃদেবেঃ ওঁ পিতা নোঽসি, তেন ত্যক্তেণ ভুজীথাঃ। নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে। হিমালয়। হিমশীতল জলস্নান রাত্রি শেষ হতেই। শিকড়ের শিরা-উপশিরারা সব। বাঙ্গলার ভিজে সোঁদা গন্ধের মাটিতে, ভারতের মৃত্তিকায় এঁকে বেঁকে প্রসারিত দূর বহুদূরে। ঔপনিষদিক নয় শুধু, লালন ফকির, বাউল, বৈষ্ণবী যে বলেছিলঃ সবুজ গাছের তলায় হবে আমাদের আলাপ।

হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, তবু করুণাঘন বুদ্ধ বোধি যাঁর বিলাস হর্ম্যছেড়ে তপের শিখরে, অবশেষে প্রজ্ঞায় উৎপন্ন অহিংসার বাণীঃ ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। আর এক বোধিবান, কবিই, মুসলিম শাখায় বাঁধলেনঃ সাদী, জালালুদ্দিন, রুমি, হাকিজ—হিন্দু শাখায় রামানন্দ, বেদান্ত। উৎপন্ন কলম

নন্দনগন্ধ ফুল, অনাস্বা দিতপূর্বফল, শাখায় পাতায় সবধর্ম সামঞ্জস্যের সবুজ ; রবীন্দ্রনাথ চমকিত হয়েছিলেন পঞ্চদশশতকের সেই দোসরের দিকে চেয়ে, বিস্মিত অনেক সময়ই, এ-যে আমি।

চন্দ ঝলকি যাহি ঘটমাহিন্

চন্দ্র ঝলক লাগিয়েছে ঘটে, আমিই দেখতে পাইনে শুধু,

ইস্ ঘট অন্তরবাগ বাগীচে।

এই পাত্রখানির মধ্যেই বাগান, মালঞ্চ, কুঞ্জ, পাত্রখানিতেই সাতসমুদ্র, এক আকাশ তারা। পরশ পাথর, যাচাই-জহুরী সবই এই পাত্রখানি। কবীর বলছেন : শোনো, আমার বন্ধু, আমার প্রভু আমার মধ্যেই।

শিরা-উপশিরার কোনো কোনো শাখা রস নিয়েছে নিধুবাবুর প্রেমের গানে, পদাবলী কীর্তনীয়াদের কীর্তনে। উজ্জয়িনীর কবি কালিদাসেও দিয়েছিলেন শেকড় মেলে অনেকখানি।

অনেক শেকড় ভারতের মাটি ছেড়ে গিয়েছিল বৈ-কি বিশ্বের মাটির সন্ধানে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া জার্মানী, ফ্রান্স। বদল্যার পড়া ছিল তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেন সাহচর্যে। তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার তরণীর অধিশ্বরী অথচ কোনোকালে নয় বদল্যারের : Le voyage.

রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি বৃষস্কন্ধ, চওড়া হাতের কব্জি। ভিতরে, বাহিরে বীর্য। পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রতীক। তুলনায় আলো-অভিসারী গ্যয়টে : আলো, আরো আলো। বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য : তবে তো নেহাৎই শিশু। বিশশতকেও অনেক সব শতক পিছিয়ে, চড়ে উঁচু চূড়ার গজদন্ত মিনারে চশমার রঙে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন বিশ্ব-জগতের সত্য বাস্তবতা বর্জিত মিথ্যা রঙীন ছায়া। অমঙ্গল, পাপবোধ কিছুই ছিলনা তাঁর। নৃত্যচ্ছন্দে রয়েছে জীবন নদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকার কালেও।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা যথোচিত অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাই জানেন—এটি মিথ্যা অভিযোগ। অশুভ, অমঙ্গলতার বোধ তাঁকেও আক্রমণ

করত বৈ-কি। অন্ধকার, বিতিকিচ্ছি, কিম্ভূতকিমাকার সব চেহারা তাড়া করেছে ভীষণ ভাবেই, সর্পিল পিচ্ছিল—শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধতার পথযাত্রায় পাপ এবং অশুদ্ধতার তীক্ষ্নমুখ শরবিদ্ধ। অবশ্য পাপের conception আমরা আধুনিকেরা যে ভাবে ঋণ নিয়েছি, সে ঋণ নিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর conception অন্যায়, অমঙ্গল, অকল্যাণ। সুদীর্ঘ জীবনযাত্রায় নিশ্চিত হয়েছিল, কিছু বা স্খলন। তবু নয় শেষ কথা ঃ বিমর্ষতার চর্চা চক্রবৎ, গড়া কৃষ্ণাভেনাসের মূর্ত্তি বারংবার

"এসো পাপ, এসো সুন্দরী।"

চির-উচ্চারণ ছিল শুভ-উচ্চারণ ঃ যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

*　　　*　　　*

হিংস্ররূপ বিশশতকের এড়ায়নি দৃষ্টি তাঁর। বুক ভরে ছিল ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায়। সংশয় মাঝে মাঝে চিড় ধরিয়েছে অটল বিশ্বাসে। কেঁপেছে প্রত্যয়। বিজ্ঞানে অনীহা নয়, স্পৃহাই বরং, যদিও সেটা তাঁর স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্র নয়—তবু বিশ্বের রহস্যে ভরা বিশ্বপরিচয়। বিজ্ঞানের টেকনোলজি যেখানে এগিয়ে এসেছে মানুষের কল্যাণে, রবীন্দ্রনাথ সমাদর জানিয়েছেন ঃ নলকূপ, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজের অগ্রগমন। বিজ্ঞান যেখানে হিংস্র, ধ্রুম্রমুখ ধ্বংস, রবীন্দ্রনাথ বিপক্ষে। আইনষ্টাইনও চিন্তাকুল মানুষের সম্পদের এই উত্তরাধিকার কীভাবে বাঁচানো যায়? রবীন্দ্র-চিন্তা, আইনষ্টাইন-চিন্তার সমর্থক, বিজ্ঞানেরো সম্পদ যা, শুভ যা, তাই আমরা গ্রহণ করব ঃ যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

অনেক লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিম্বলিক এবং নৃত্যনাট্য। স্বজীবনে ঘটতে দেননি নাটকীয়তা। সমস্ত শক্তি, সংহত, সঞ্চিত বিন্দু বিন্দু জলধারা, উৎস, ছোট ছোট শাখা নদী, তার কোনটি লুপ্ত হতে দেননি। সমস্ত টেনে এনে অগাধ জীবন-প্রচেষ্টায় অতঃপর সৃষ্টি-স্রোতস্বিনী। সৃষ্টির ঢেউ সব সময়ই চলেছে বয়ে, নিরবধি,

দিন-রাত্রি, সন্ধ্যা-সকাল, দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ণ। যা কিছু এসে পড়ছে তার মধ্যে, হয়ে যাচ্ছে ঃ গল্প, কবিতা, নাটক, গান। মুহূর্তের চেতনাও যায়না ফেলা। ভৃত্য দিল উঁকি ঃ

হে মাধবী দ্বিধা কেন,

তৃষ্ণাতুর শান্তিনিকেতনে বসল নলকূপ ঃ

এসো এসো তৃষ্ণার জল

দিনরাত্রি অবিরাম, অবিশ্রান্ত স্রোতোধারা। সত্তর পার আশীতেও। কোনো একটি মুহূর্ত নিশ্চল হলেই বেদনা ঃ

হায়—কিছুই তো হোলনা

আর আমরা? সামান্য ছোট একটি জলাশয় রচনা করতে গিয়েই সর্বস্বান্ত।

*　　　*　　　*

কবি, মনীষী, উপাসনা, ভাষণ, এইরূপে তাঁকে দেখেছি দেশী-বিদেশী মননশীলদের সঙ্গে মননালাপে রত; রাত জেগে লেখা আবার ভোরের আলো না ফুটতেই বসা লিখতে, অতিথি অভ্যর্থনা-সভাপতিত্ব, আচার্য রূপ—আবার দেখেছি অভিনয়, গান শেখানো—শুধু এই রূপেই নয়। দেখেছি মানব চরিত্রের পূর্ণরূপসাধনা অনেক ছোট ছোট ক্ষেত্রেও। তারমধ্যে রয়েছে সরল জলধারা, হাসিঠাট্টার ঢেউ। সাধারণ পণ্ডিতমন্য ইন্‌টেলেকচুয়ালদের কাছে যা অবিশ্বাস্য প্রায়।

যদিও কেন্দ্রবিন্দুতে অগাধ-আশ্বাস, তবু মানতেন না স্পেশালাইজেশানই একান্ত। জীবনের সবগুলি দিকে স্পর্শ না থাকলে খর্বতা। অঙ্কে মেধাবী সংগীত-উদাসীন এক ছাত্রকে বলেছিলেন, গলায় গান না এলেও সেতার শিখতে পারিস্। নইলে তোর সেতারিণী স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হবে কী উপায়ে?

অনেকদিন পরে পড়তে গিয়ে **Allexis Carrel** এর **Man the unknown,** ফিরে মনে পড়েছিল কী আশ্চর্য চিন্তাধারার মিল দুজনের। **Man as known to the specialists, is far from**

৬

being the concrete man, the real man. আবার বলছেন ঃ Man cannot be seperated into parts. He would cease to exist if his organs are isolated from one another. মানুষের পূর্ণমানব চরিত্রটিও তো তাই। কিছু vital organs তার থাকলেও সমবেত সমন্বয় জরুরী। মনন, অনুভব, রসবোধ, প্রেম, করুণা, কাব্য, শিল্প সমস্তের পাশাপাশি প্রাজ্ঞতা এবং বালকত্বও।

দেখেছি তাঁর শক্তি। আমরা সমবেত, আমরা কিছুই জানিনে, গুরুদেবের বাঙলার ক্লাশে এসেছি, উদিচীতে ঢুকতে যাব, সামনে এসে দাঁড়ালেন অনিলদা, ভয়ভীতত্রস্ত চেহারা। বললেন ঃ গুরুদেবের ডায়েরিয়া হয়েছে, বেশ বেশী। তোমরা আজ ক্লাশ নিয়ো না, কিছুতেই নয়।"

সবাই ফিরে যাচ্ছি, ভেতর থেকে গুরুদেবেব নির্দেশ এলো— "ক্লাশ হবে।"

ভেতরে প্রবেশ করলে বললেন "এমন রোদ্দুরে এতখানি পথ ভেঙে কষ্ট করে তোমরা এলে। আমার কোনো কষ্টই নেই।"

ডায়েরিয়া আক্রান্ত, আশী বছর বয়স, অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ঃ অনায়াস ক্লাশ নিলেন। জানলাম, সত্যকার রবীন্দ্রনাথের সত্যিই কোন কষ্ট নেই।

দিনক্ষণ তারিখ মেপে বলতে পারব না। সেটা হারিয়ে গেছে। সিংহসদনে সাহিত্যিক, সভাপতি হয়েছেন। এ্যাসরটেড্ রচনায় খুব খুশি হলেন না। বললেন ঃ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ একসঙ্গে মিলিয়ে সভা হলে তাতে মন দেওয়া এবং বিচার করা শক্ত হয়ে পড়ে। তার চেয়ে শ্রেয় কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধের পৃথক সভা।

*   *   *

দেরাদুন বাসিনী রেখে যাচ্ছেন দুটি শিশু কন্যা।

—"আমাকে উত্তরায়ণে নিয়ে যাবে।"

উত্তরায়ণ ফটকে পৌঁছেই মুখ সাদা, সমস্ত রক্ত সরে গেছে। কাঁপছে গলা—"কী বলব?"

—"কিছুই বলবেন না। কথা বলে রবীন্দ্রনাথকে অবাক্ করে দেবেন, নাইবা ভাবলেন। প্রণাম জানাবেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেবেন।"

রবীন্দ্রনাথ তো আমি নন, বোধকরি দেখলেন মেয়েটির সাদা মুখ। চণ্ডালিনীর মানবীয় প্রেমের অপমান যাঁর সয়নি বৌদ্ধজাতক কাহিনীর যিনি জন্মান্তর ঘটিয়েছেন আপনসম্মান বোধের মর্যাদা দিতে, মহিলাটিকে আত্ম-অসম্মান পীড়া থেকে মুক্তি দিতে ওরি স্তরে এসে গেলেন।

—"মেয়েদের রেখে যাচ্ছ? কটি ছেলেমেয়ে? কিচ্ছু চিন্তা কোরনা, বেশ ভালোই থাকবে এখানে। বাপের বাড়ী কোথায়? শ্বশুর বাড়ী? কে কে আছেন? কটি দেওর? ননদ? ওমা, ননদ নেই, কী সুখে শ্বশুরঘর কর গো?

জবাব দিতে দিতে মহিলার খিল্‌খিল্ হাসি। মুখের সাদা ভয় মিলিয়ে জীবনের রক্তিম রক্তরাগ।

* * *

শিশুবিভাগের ছেলেমেয়েরা প্রণাম করতে এলে হাতে কিছু না নিয়ে ফিরত না। কাঁচের বোয়ামে থরেথরে সাজানো টফি, লজেন্স, চকোলেট। সাধারণতঃ, আলুদার জিম্মেদারী।

—কি নিবি?

কেউ টফি, কেউ লজেন্স, কেউ চকোলেট। একবার একটি ছেলের মুখে জবাব নেই। দৃষ্টি এক বোয়াম ছুঁয়ে অন্য বোয়ামে বিভ্রান্ত।

গুরুদেব হো হো হেসে উঠলেন: প্রাণমাতানো হাসি।

—আলু, এই বয়সেই ভুলে গেলি সব? আমি তো আশীতেও ভুলিনি। ও মন স্থির করতে পারছেনা। সবগুলোর মুখ খুলে দে।

ছেলেটি তিনটে, চারটে বোয়ামে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে দে-দৌড়।

খুব অবাক লাগত আমার, গ্রামের মানুষগুলি কত সহজে এসে যেত কাছে। নববর্ষের প্রণাম সেরে একবার গ্রামের এক বয়স্কা :
—"কী ওষুধ দিলে ঠাকুর, আমার গোপালের মাথাধরা তো ছাড়ল না।" অসঙ্কোচ গলা, অনায়াস-অভিযোগ, ডাইরেক্ট এ্যাকশান। হেসে বললেন,—"গোপালের মা, আমার দোষ দিয়ো, আমার ওষুধের নয়। এবার আরো ভালো ওষুধ দেব।"

অথচ আমি কতবার কাছে গেছি, বসেছি পাশেই মোড়ায়। কতবার তাঁর হাত আমার মাথায়, পিঠে। হাসি, কথা, আলাপ ক্বচিৎ ঠাট্টাও। একবার বলেছিলেন, তাঁর কোন কথার জবাবে আমার কথা শুনে :

—যত নম্র হয়ে থাকো, তত নম্র নও। নমিতা নাম তোমাকে মানালো না।

তবু মন ভয়সম্প্রমাস্পদ। অবশ্য ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো যেমন তাঁকে দেখেছিলেন প্রথম দর্শনে, তেমন দেখিনি কোনোদিনো। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মিশ্রিত মাধুরী, দেখিনি আমি। অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের সঙ্গেই দেখেছি অবিশ্বাস্য মহত্ব। যাঁর অনুচ্চারিত ওষ্ঠের ভাষা—আমার অনেকখানি সময় নিয়ে নিলে তোমরাই বঞ্চিত হ'বে অনেকখানি থেকে। যাঁর ঠোঁটের হাসি খুব কাছের মনে করালেও চোখের সুদূরতা জানিয়ে দিত—তিনি এখানে আছেন, অথচ নেই।

অদৃশ্য এক পর্দা তুলত আমার সামনে
তাকে ঠেলে যাই এমন সাহস নেই।

গুরুদেবের সঙ্গেই স্মরণ আর একজনের। রবীন্দ্রনাথকে যিনি দিয়েছিলেন ডাক ঃ গুরুদেব। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে মহাত্মাজী।

শান্তিনিকেতনে গান্ধী-দিবসপালন দিনে সমস্ত কাজের লোকদের ছুটি। কাজে নেমে পড়তে হয় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। যাঁরা যত বড়ো, ততো গুরুভার। সেদিন হরিজনদেরো ছুটি।

গান্ধীজীকে আমি শান্তিনিকেতনে দেখিনি। শুনেছি উপবাস-ভঙ্গের মুখে শুনেছেন, গুরুদেবের গান ঃ

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীতিসুধারসে এসো।

গান্ধীজীকে দেখেছি অনেক পরে। বেলেঘাটার স্মরণীয় সেই সভা, সঙ্গে সুরাবর্দী সাহেব বড়ো বেমানান। সেই সময়, রক্তাক্ত বেদনার, পুঞ্জীভূত হিংস্র হিংসার, মানানো-বেমানানোর প্রশ্নই ছিলনা। মানুষ একমন ঃ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সেদিন দেখেছি আমি, কত মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে কত ছেলেকে রক্তাক্ত হ'তে। কত স্ত্রীর বাহুপাশ থেকে স্বামী। কত মূঢ়মূক স্বামীর চোখের সমুখে স্ত্রী ধর্ষিতা। হায়রে, আমাদের তো টলষ্টয় ছিলেন না, পেলাম না যুদ্ধ ও শান্তির মতো বই অথবা তদপেক্ষাও—এমনকি সাধারণ Uri Leonর Milla 183 নয়। কিছু কিঞ্চিৎ আভাস খুশবন্ত সিংএর Train to Pakistan.

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মিছিলে পা মিলিয়ে বেলেঘাটা। আমাদের মিছিলের মাথায় অনেক ফুলের পাপড়ি। গোলাপ জলের ঝরণা ঝরেছে। শ্লোগান উঠেছে থরথরিয়ে কেঁপে ঃ হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই, ধুতি-লুঙ্গী এক হো। ফেরবার পথে একটি মেয়ে নাম মনে নেই। মনে আছে সাহস, বুদ্ধি, জানবার অসঙ্কোচ আগ্রহ ঃ

—"দিদমণি, আমরা জেনানা, জানিনা কিছুই, কিছু জানাবেনা ?

সে আমাদের নিয়ে গেল গলিগলি পার করে ভিতর গলিতে। গলিপথেই পেতে দিল মাতুর। পিতলের কানা উঁচু কাঁসিতে লাড্ডু আর বদনায় পানি। আকাশ বাতাস ফোঁড়া চামড়ার গন্ধ, তীব্র, তীক্ষ্ণ। হঠাৎ সমস্ত তীক্ষ্ণতাকে ফাটিয়ে ফেটে পড়ল এক চীৎকার ঃ

—"কাফেরের মেয়েদের এনেছিস্ তুই ?"

মেয়েটি হাত জোড় করল, মাফ করো ওকে। ওরঘরে একটিও আদমী লোক নেই। ওর মিঞা, লেড়কা, ভাই, আব্বাজান। ওকে মাফ্ করো। কান্নাভরা গলাটা থরথর করে উঠল। আমাদের চোখে জল, চেয়ে দেখি মধ্যবয়সী মহিলা। রক্তাক্ত চোখে উন্মাদ-দৃষ্টি।

মেয়েটি আবার বলল ঃ ওকে মাফ্ করো, কিন্তু বলো, কেন গেল সব ?

আমার সহযাত্রিনীরা একে একে উঠে বক্তব্য পেশ করল। বক্তব্য একই, ভঙ্গীও খানিক কাছাকাছি, শুধু কণ্ঠস্বর পৃথক। সর্বসম্মত রায় ঃ দোষী একমাত্র বৃটিশ সরকার। আমার মন বলল ঃ প্রশ্ন রয়ে গেল নিরুত্তর। বিদেশী সরকারকে দায়ী করে দায়মুক্ত, এও ছেলেখেলা। অপরাধ উভয়ত, উভয় দিকেই জড়ো।

বালীগঞ্জের সেই সন্ধ্যায় আমরা কয়েকটি মহিলা নামলাম জীপ থেকে। নামিয়ে দিয়ে ওরা বলল ঃ নমস্কার বোন, নমস্কার দিদি। আমরা বললাম ঃ সালাম ভাইসাহাব।

গান্ধীজী পদযাত্রারত, খবর পাই সংবাদপত্রে। নোয়াখালি এখানে-ওখানে। বুকের কন্দর তাঁর ব্যথা দিয়ে ভরা। ১৯৪১ এর ৭ আগষ্টের মতো ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারী, আমি সেদিনো দেওঘরেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অপরিসীম লজ্জাকর বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল। ৩১ জানুয়ারীর ভোরে স্কুলের মেয়েরা বেরিয়েছে শোকযাত্রায় ঃ কিছু বাঙালী কন্যা, কিছু বিহারের ঃ

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম
জয় রঘুনন্দন জয় সীয়ারাম, জানকী বল্লভ সীতারাম।

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে, দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলোরে॥

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, মিছিল চলে যাচ্ছে দূরে, কানে আস্‌ছে দূর থেকে একলা চলোরে।

স্তব্ধ আমি হৃদয়ের গভীরে গভীর উচ্চারণ ঃ

হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা
করোহে আমার লজ্জাহরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ॥

নন্দলাল বসু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে দোলায় নূতন বিত্ত (রবীন্দ্রনাথ)

দেখেছি মাষ্টারমশায়ের প্রণাম করা গুরুদেবকে, তদ্‌গত। দুহাতে-দুটি পা ধরে ললাট রেখেছেন বেশ কিছুক্ষণ। আমরা যারা দেখেছি সেই প্রণাম করা মনের মধ্যে খুশির সঞ্চয় নিয়ে ফিরেছি।

শ্রদ্ধা আর স্নেহ, পাশাপাশি দুটি ধারাই-প্রবল। ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসতেন আশ্চর্য রকম পিতৃস্নেহে, ফিরেও পেয়েছেন প্রতিদানে।

নিবেদিতা বলেছিলো—কী disillusion আমার, really। দু'বোনেরি ঝোঁক আর্টিষ্ট হবো। বাবা নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। বোনের নির্বাচন ফ্রান্স। আমার শান্তিনিকেতন। বম্বে থেকে জপতে জপতে আস্‌ছি: নন্দলাল বসু, নন্দলাল বসু। ওঁর সেই ছবিগুলি আছে মনের গভীর জুড়ে। বন্দীজীবনী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, উমার প্রত্যাখান।

কলাভবনে বাবা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন, আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। কখন নন্দলাল বসুকে দেখবো? বাবা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে বললেন: ইনিই মাষ্টারমশায়। হা হতোস্মি—প্রথম দর্শনেই, একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সব টলমল করে উঠল। ছোট ছোট ছাঁটা চুল, উঁচু করে পরা ধুতি, কালো রঙ, শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় কোথায়ো লেগে নেই।

—তারপর? এখন?

—তারপর? দেখলাম ওঁর শিক্ষাদানের প্রতিভা, কর্মধারা, আমাদের সুপ্ত শিখাটিকে নিজের শিখা থেকে আলো ধরিয়ে জ্বালিয়ে, জাগিয়ে দেওয়া, হাত আড়াল করে সমস্ত বাধাবিঘ্ন থেকে বাঁচানো।

তাদের বড়ো হতে সাহায্য করা, ভালোবাসা। মাষ্টারমশায়ের জন্যে এখন আমরা সবকিছু করতে পারি। হেসে বলেছিলাম : গুরুদেবের দরবারে রেখে এসো, হয়ে যাবে আর একটি রাজা বা অরূপরতন।

রবীন্দ্রনাথ ভিতরে বাহিরে শিল্পী। বড়ো যত্ন, বড় সমারোহ রবীন্দ্র সৃজনে, রাজকীয়, রাজবত্নীত তো বটেই। গ্রাম-উন্নয়ন, পল্লীসেবা, আমাদের মতো অজস্র সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে ভালোবাসা, উঁচু থেকে নেমে আসতে হ'ত তাঁকে। যেমন নামে নদী হিমবন্ত হিমশিখর থেকে অথবা কনখলে গঙ্গা হিমালয়েব গা বয়ে নামে তীর্থভূমিতে মাটির প্রেমে। মাষ্টারমশাই গ্রামের দীঘি, সরোবর : অথবা গ্রামের বুকের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তরতরে নদীটি : অসংকোচস্নান, পান, কাজসারা, ধোপার পাট বিছানো। ছাত্র-ছাত্রী আমরা তাঁর কাছে গেছি সেইভাবেই। তিনিও যেতেন গ্রামে দুপুর রদ্দুরে, ভেজা গামছা মাথায় ফেলে, গ্রাম্যজীবনে একান্ত মানানো। একরাশ স্কেচ্ এনে দিতেন ছাত্রছাত্রীদের গ্রাম্য পড়শীদের রেখেছেন ধরে।

কথা হতো মাঝে মাঝে, ঠিক ভাষণ দেবার মতো নয়, কিন্তু, বেশ বুঝিয়ে বলতেন। যদিও ভালোই লিখতেন, শিল্প সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত তাঁব দুখানি বইতেই তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে, তবু সংকোচ ছিল তাঁব। একদিন বলেছিলেন : বলবার ভাষা আমার তেমন নেই, তুমি আমাকে একটা কাগজের টুকরো আর পেনসিল এনে দাও, আমি অনেক ভালো করে বলবো রেখার আঁচড়ে। বলেছেনও তাই, প্রায় সারা জীবনই কথা কয়েছেন তুলিতে রঙে রেখায়। আর কথা কইতে শিখিয়েছেন রঙ তুলির অনেক ছাত্রছাত্রীকে।

একদিন বলেছিলেন, কারুর নাম করে, ও যদি মেয়ে না হোত, নন্দলাল হোতে পারত। কিশোরীনারীসত্তা আঘাতে অধীর, ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রশ্ন,—"মেয়েদের মধ্যে তবে শিল্পীসত্তা নেই?" —আছে, তার লালন নেই। তোমাদের মুস্কিল কী জানো, সময়ের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু খুঁটিনাটি কাজে চলে যায়। স্বামী, ছেলেমেয়ে,

শ্বশুর-শ্বাশুড়ী পরিচর্যা ছাড়াও, স্বামীর বন্ধুরা বললো : চমৎকার কাটলেট, সুন্দর ঝুরি আলুভাজা আপনার, আর সেদিন যে কেক করেছিলেন ফিরপো বা গ্র্যাণ্ডকেও হার মানায়। তোমরা বসে গেলে তাই নিয়ে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, উচ্ছিষ্ট সময়, তাই দিয়ে আর যাই হোক, কলার উপাসনা চলেনা।

তবু রেখেছি প্রশ্ন, বলেছি, মধ্যবিত্ত আমাদের সকলেরি দায় সংসার-পালনে, পুরুষরাও বাদ পড়েন না তার থেকে।—সেকথা বলেছো ঠিক্, তাই আমাদের মধ্যে যতখানি হবার ক্ষমতা থাকে তার অনেকখানিই ঝরে যায়। সেই জন্যেই আমাদের অনেক চিন্তায় বেছে নিতে হয়—শ্রেয় কী।

এই উপলক্ষ্যে স্বজীবনের কাহিনী বলেছিলেন সংক্ষেপে। ১৩২১ এর বৈশাখে, বোধকরি ইংরেজী ১৯১৪ সাল ছিল, বেড়াতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতন। তখনো কল্পনাতেও আসেনি, এই হবে তাঁর সারা জীবনের কর্মক্ষেত্র, সাধনার স্থান। গুরু অবনীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবনে আছেন। পরিচিতিও হয়েছে বেশ। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান এলো। ওদিকে বাহিরের আর্টকলেজও ডেকেছে, (যতদূর মনে পড়ে মাদ্রাজ আর্টকলেজের কথাই বলেছিলেন) লোভনীয় প্রস্তাব ঃ মাহিনা অনেক, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ, সংসারের সব মানুষের সুখ বাড়ী, গাড়ী, মোটা সঞ্চয়। তুলনায় শান্তিনিকেতনে দারিদ্র্যর সঙ্গে মোকাবিলা। একটু থেমে বলেছিলেন, ভেবোনা, মুহূর্তেই মন স্থির হোয়েছিল, ভাবলাম অনেক, ভেবে দেখলাম শান্তিনিকেতনেই হ'তে পারবে আমার স্বকীয় সত্তার বিকাশ। গুরুদেব আমাদের সেই অধিকার দিয়েছেন, স্বাধীন চিত্তের বিকাশ। আমি এসে গেলাম। এর আগেই এসেছেন সুরেন কর, অসিতকুমার হালদার। তিনজনে মিলেই গড়ে তোলা কলাভবন।

ভোরবেলায় আকাশ যখন জবাকুসুম রঙে রাঙিয়ে উঠত মাষ্টারমশাই এসে বসতেন পূবের বারান্দায়। ছবি আঁকার সরঞ্জাম সেখানেই, মনে লাগত তন্ময় উপাসনায়।

*　　　　　*　　　　　*

আমরা মেয়েরা অধিকাংশই জেনারেলাইজেশানের পথে যাই লে। আর যেতে যেতে বিস্মরণ কেন্দ্র-বিন্দু, বৃত্ত কৈশোরকে যেটুকু টানা তাই, কখনো তাও বা কুঞ্চিত। আসলে আমরা carry করে নিয়ে যাইনা আমাদের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিন্দুগুলির সমাহারকে। শেষ পর্যন্ত মোচার ঘণ্ট, বিরিয়ানি, কেক, পেস্ট্রী, দিশি বিলিতী সংস্করণ, টেবিলে সাজানো দু'চারটে ফুল জাপানী ষ্টাইল, পর্দায় বাটিকের আঁচড় শান্তিনিকেতনী, দু'চারটে গান, একটুখানি বাজনা, মিঠেগলার, মিঠে হাতের, অল্পনাচের ঘোরাফেরা—ফ্যাসনমাফিক্ ইংরেজী অথচ বহুদূরে সরানো পড়বার যোগ্য বইগুলি, কিছু ড্রাইভিং হাল আমলে, ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বরশিপ, ব্যাড্মিন্টন্, টেনিস্; কায়দা করে বললে ঃ অলরাউণ্ডর স্কোয়ার।

জানি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছিলেননা স্পেশালাইজেশানে বিশ্বাসী। অখণ্ড সম্পূর্ণ মানব-প্রত্যয় তাঁর। তবু কেন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে অগাধ সচেতন। সে তো স্পেশালাইজেশান প্রায়। এবং টোনেও অবহিত। কার কতখানি মূল্য, কোথায় দিতে হবে জীবন সময়ের অংশ কতখানি।

শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁকে জেনেছিলাম, তিনি মাষ্টারমশাই, নন্দলাল বসু। চরিত্রের একটি জায়গায় দু'জনের আশ্চর্য রকম মিল। কেন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে অগাধ সচেতন, অথচ টেনেছেন বৃহৎ circle আপনার পরিবার পরিধির অনেক বাইরে।

একটি ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করে মাষ্টারমশায়কে প্রণতি জানিয়ে যাব। সময় ১৯৪৫ কি ১৯৪৬ হবে, আবার এসেছি শান্তিনিকেতনে, থাকি বন্ধুর মায়ের কাছে। সে সময় দারুণ এক আর্থিক অনটন চলছে। ফের থাকতে চাই শান্তিনিকেতনে অথচ হস্টেল খরচ চালানো সম্ভব নয়। মাষ্টারমশায় সমস্ত শুনলেন ধীর অবহিতিতে। বললেন ঃ আমি তোমাকে এখনি কলাভবনে নিয়ে নিতে পারি, দক্ষিণা লাগবেনা। কলাভবন কীচেনে খুব কম

টাকায় খাবার বন্দোবস্তও হয়ে যাবে। কিন্তু, তোমাকে একটা কথা ভেবে দেখতে হবে, কী হ'তে চাও তুমি আর্টিষ্ট না সাহিত্যিক। কলাভবনের কাজে তোমাকে ক্লাশের সময় ছাড়াও আরো অনেক সময় দিতে হবে। সাহিত্যের জন্য সময় বাঁচাতে পারবেনা। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখে চলে এলাম। একটি আর্টিষ্টের জায়গা জুড়ে রেখে অন্যায়ই করব। নিজেরো বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবনা, একটি শক্তি শালী শিল্পীর ক্ষতি করে বস্‌ব। আমি তো অবনঠাকুর হতে পারবনা কোনো কালে রেখা আর লেখা চলবে সমান তালে।

সেই সময় দেখেছি মাষ্টারমশায়ের প্রসন্ন দাক্ষিণ্য। আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন এমন সস্নেহে আর্থিক দীনতার বোধে একটুও পীড়িত না করে, মনে হয়েছে হৃদয়ের পরিধি অনেকখানি ব্যাপ্ত হলেই তবে এমন করে পারা যায় স্নেহের ছলে দান করতে।

মাষ্টারমশায় চলে গেছেন। আমিও চলে যাব হয়তো আর কয়েকবছর পরেই। তবু থেকে যাক্ আমাদের শান্তিনিকেতনের সেই সময়কার শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর সম্পর্কখানি। আজকের দিনে যা বিস্মৃতপ্রায়। মানবিক সম্পর্ক বোধের অত্যন্ত মূল্যবান একটি দিককে আজকের ছাত্রছাত্রীরা বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করতে পারে না। শ্রদ্ধা করতে পারাও যে মস্তবড় প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির ভূমিচ্যুত তারা আমার কাছে মনে হয়, একালে এটি বড়ো বেদনাবহ।

ক্ষিতিদাদুর কথা স্মরণে এলেই স্মরণ, বুধবার মন্দির, গম্ভীরকণ্ঠে মন্ত্রোদ্ধার, বাংলা অনুবাদ পাঠ, তারপর মৃদুকণ্ঠঃ সংগীত। অমনি এস্রাজে লেগে যাওয়া ছড়ের টান।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনা, কবীর দোঁহার ভক্ত, বাউলে প্রীতি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মানুষটিকে বেশ কয়েকটি চেহারায় দেখেছি। কিন্তু, সবচেয়ে বেশী অপরিসীম শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথে।

একদিন রবীন্দ্রনাথের ক্লাশের পরই ক্ষিতিমোহন সেনের। ক্লাশ বলাকা-কাব্য-প্রবাহ। উদিচী থেকে বার হয়ে, উত্তরায়ণ ফটক ছাড়িয়ে, রান্নাবাড়ীর পাশে এসে বাঁয়ে বেঁকে লাইব্রেরী অভিমুখ না হয়ে সোজা গুরুপল্লী চলেছেন। দিনান্তিকা চা-চক্রছাড়িয়ে তাঁকে ধরলাম:

—"ছাত্র ছাত্রীরা আপনার ক্লাশ চাইছেন।"

—"একটা প্রশ্ন করব, সত্যি জবাব দেবে?"

—"করুন।"

—গুরুদেবের ক্লাশের পর আমার ক্লাশ আলুনী লাগবে না?

নতমুখ, নির্বাক আমি। জবাব দিতে পারছিনে।

হেসে উঠ্‌লেন—"এর পরেও ক্লাশ নিতে বলো?"

চলে গেলেন, রাগ করে নয়, বলে গেলেন:

"গুরুদেবের ক্লাশের পরে আর কারুর ক্লাশ নেওয়া চলে না।"

রবীন্দ্রনাথ যদি কোহিনুর, ক্ষিতিদাদু চূণী। রসের রক্তিমধারার বিচ্ছুরণ প্রায় সর্বক্ষণই। একবার কলকাতায় বেশ ভীড়, তাঁকে দেখেও দূরেই আছি, ভীড় কমতে আমাকে দেখতে পেলেন।

—এ-কী, কথা বল্‌ছোনা যে?

—ভিড় বড়ো বেশী তাই ভাবছিলাম—লজ্জিত আমি

প্রণাম করছি নত হয়ে। মাথায় হাত রাখলেন, হেসে উঠ্‌লেন তাঁর উচ্চকণ্ঠে। বললেন : ভাবছিলে কবে পৃথিবী নির্জন হবে তবেই তুমি কথা বল্‌বে।

আমাকে দিয়েছিলেন আশীর্বাদ স্বরূপ তাঁর কয়েকখানি বই, আর সবগুলিতেই স্বহস্তে নাম আর আশীর্বাদ লিখে। নববর্ষের আশীর্বাদী চিঠিও ছিল খানকয়। বেশ কয়েকবছর রেখেছিলাম সযত্নে। এদেশ-ওদেশ করার কালে তার অনেকগুলি গেলো হারিয়ে। কিন্তু, মানুষটি হারান নি। তাঁর হাসিখুশি ভরন্ত মুখ ভরাট গলা নিয়ে মনের মধ্যে জায়গা করে আছেন।

মল্লিক্‌জী

যো শোয়ত হ্যায় সো খোয়ত হ্যায়
যো জাগতে হ্যায় সো পাওয়ত হ্যায়
উঠ্‌ জাগ্‌ মুসাফির, ভোর ভরি।

হয়তো তাঁর ভালোবাসা ছিল মুসাফিরের মতই। সকলের ওপর ছড়ানো ; আমরা তা ভাবতামনা, ভাবতাম আমাদের ওপরেই তাঁর ভালোবাসা, মায়া।

ছোট মাটির ঘর, উপকরণ নেই বললেই হয়। মাত্র একটি উপকরণেই ভরপূর। মল্লিকজীর সাদা দাড়ির শিশুহাসি। কোথায় ডেরাইস্মাইলখান্‌ কোথায় শান্তিনিকেতন! নর্থওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ামের (এখন পাকিস্তান) ডেরাইস্মাইলখানে তাঁর জন্ম, পাঞ্জাবে উঠ্‌লেন বড়ো হয়ে, কলেজের শিক্ষা নিলেন বম্বেতে, করাচীতে কাটালেন কিছুদিন। তারপর শান্তিনিকেতনে এলেন।

তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে আমরা পেতাম "ঘরে এসো" ডাকের মায়া। দল বেঁধে যখন গেছি, তাঁর বিছানার ওপরেই বসেছি আমরা। মল্লিকজী বসতেন চেয়ারে বা টুলে। সেই ঘরটিতে পেতাম বাড়ীর স্বাদ। অথচ ঘর বলতে যা বোঝায়, ঠিক সেই ঘর তাঁর ছিল না।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে কখনো ভেবেছি বসে কোনোদিন কাঁকন পরা হাতের বেদন-রোদন বেজেছিল বুকে? কে জানে সে কথা? সে আমাদের অগোচরেই ছিল। শুধু এইটুকু জানি: যে যখনি গেছি। একান্তই ব্যক্তিগত দায়ের আর্জিতে ছোটবড়ো, ছেলে-মেয়ে, তাঁর হাতবাড়ানো থাকত তাঁর হাসিটির মত।

বুধবার প্রার্থনা সভায় মাঝে মাঝে গেয়েছেন ভজন। আমাদের অনুরোধেও কখনো কখনো সুফীসন্তদের গান আমাদের দলে বসে। "অন্ধেরী দুনিয়া ভজন বিনা" কিংবা "তব শরণাই আয়ো, আয়ো মেরে ঠাকুর"। মনে লাগত না সচেতনশিল্পী: যুক্ত অযুক্ত একযোগেই **communicated** বটে কিন্তু **alianation** এর মাথা ব্যথা নেই। চোখের জলে ভেজা, গলার স্বর ভাঙা। ভিতর-বাহিরের দেওয়াল-ভাঙা।

আমি তাঁকে শেষে দেখেছি আমেদাবাদে। আমার স্বামীকে আদর করে ডাকলেন: জামাইবাবু। আমার মাকে ভুল করেছিলেন, ভেবেছিলেন শ্বাশুড়ি-মা। বললেন: কী মা, আমাদের মেয়ে বেশ ভালো তো?

তাঁর স্নেহভরা চিঠিগুলি দিয়ে অনেকদিন সংযোগ রেখেছিলেন।

ফণীদাদু—দিদিমা

দাদামশায়ের বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ অধিকারির ক্লাশ নিইনি। মাঝে মাঝে বুধবারে তাঁর বাড়ীতে আহার-আমন্ত্রণ। শান্তিনিকেতনে আহার আমন্ত্রণের মধ্যকার সরলতা, আমার ভারী ভালো লাগত। রোজ যা খেয়ে থাকি, তারি সঙ্গে স্পেশাল একটা ডিস্। সাধারণতঃ, বাঙলায় নিমন্ত্রণের নামে যে অত্যাচার হয়ে থাকে উভয়পক্ষেই সেটা দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম ছেলেবেলা থেকে। সাদাসিধে খাবার, কাউকে খাওয়াবার জন্য অতিপরিশ্রমের হন্যে হয়ে যাওয়া ভাবটা

নেই, এইটেই আমার ভালোলাগত। মাঝে মাঝে ফণীদাত্নও দিতেন চিঠি। আমি আর শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারব না জেনে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন ঃ

আসতে পারবে না জেনে বড়ো তুঃখ লাগল। তুমি এখানকার সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গিয়েছিলে।

ফণীদাত্নর চেয়েও বেশী মনে পড়েন দিদিমা। অল্পবয়সে লিখতেন কবিতা, তুচারটি ছাপাও হয়েছিল সেদিনের মাসিকপত্রে। বিবাহান্তে শ্বশুরবাড়ীর তরফের কোনো বৃদ্ধগুরুজন, ভালোলাগল না, বাড়ীর বউয়ের লেখা ছাপার অক্ষরে বার হওয়া। তিনি বলেছিলেন, লেখা খাতাতেই আবদ্ধ রাখতে। ব্যথাতুরা কিশোরী বন্ধ করে দিলেন তাঁর খাতার লেখাও।

জানিনা, কোনোদিনো কোনো উতলা ফাল্গুনরাত্রে আমের মুকুলের গন্ধে উন্মাদিত ফণীদাত্ন তাঁকে বলেছিলেন কিনা—আমি তো আছি তোমার ভক্ত পাঠক।

এও জানি প্রেমে যাই হোক্, শিল্পে মানুষ একে অবিশ্বাসী বন্ধুর সমাদর বিনা ব্যর্থ। অন্ততঃ জনকয় বিদগ্ধ রসিক চিত্ত।

যুগ্ম

অনিলদা স্মরণেই রাণীদি, রাণীদিকে মনে আনলেই অনিলদা। যুগ্ম-জীবন, রবিশংকর মেনুহীনের যুগলবন্দী। সেতার, বেহালার দ্বৈততান। একজন হাসি আলপনে উচ্চ, উচ্ছল প্রাণশক্তিতে সেতারের ঝালার কাজ অন্যজনের তিরতিরে হাসি বেহালার ছড়ের টানে টানে ছড়ানো।

আমরা অনেকেই গেছি পুনস্বর সেই উঁচু নিচু মেঝের বাড়ীতে, এক পা ডুবিয়ে, একঘর, এক পা উঠিয়ে আর একটা। ছাত্রী হিসাবে গেছি, অন্যভাবেও। নীলা, বেলা, রমা অনিলদার ভগ্নিকন্যাত্রয়ীর

বন্ধু হিসাবেও গেছি। রাণীদির বাড়ীতেই প্রথম খেতে শিখি ভুট্টা-পোড়া, মাখন মেখে নুন গোলমরিচ গুঁড়া সহযোগে। তার আগে কলকতায় চালু ছিল না ওখাদ্য।

আশীর্বাদসহ রাণীদিও পাঠিয়েছিলেন তাঁর সব বইগুলি। "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" "ঘরোয়া" "জোড়াসাঁকোর ধারে" "হিমাদ্রি' "পূর্ণকুম্ভ"।

রাণীদির লেখা, রাণীদির আঁকা ছবি সমস্তেই শক্তির পরিচয় ছিল। স্নেহ করতে পারতেন যেমন, শ্রদ্ধাও। গুরুদেবের সেবিকার সম্মান পাওয়া যার তার কর্ম ছিল না। সকলের সেবা নিতে পারতেন না তিনি। রাণীদি পেয়েছিলেন সেই অশেষ সম্মান। অনেকদিন রাত কেটেছে সেই সৌজন্যে।

সম্প্রতি জেনেছি রাণীদি একলা। ভাবতেই পারিনে সেই যুগ্মের একাকীত্ব।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতদা বরাবর কৌতুককণ্ঠ। ঠাট্টা করবার সুযোগ সহজে দিতেন না ফসকে যেতে। ওটা ছিল বাইরের ছাঁদ, ভিতরে পাণ্ডিত্য প্রবল। গুরুদেবের জীবন ও সাহিত্যের তথ্য ও তত্ত্বের নিপুন ভাঁড়ারী। এখনো সন্দেহ সংশয় জাগলেই খুলি রবীন্দ্র-জীবনী ভল্যুম এক, দুই তিন, চার। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ ১৯৭২ সালে প্রকাশ করেছেন তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতা ঃ "রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য। সেই বইটিতেও অপরিমেয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

আমি তাঁকে লাইব্রেরী ঘরেই দেখেছি বেশী। যখনি দেখেছি মগ্ন। ভেবেছি এই মানুষটি কৈশোর পার হতে না হতেই তরুণ বয়সেই স্থির করে নিয়েছিলেন আপন ভবিষ্যৎ। শান্তিনিকেতনেই কাটাচ্ছেন তাঁর সমগ্রজীবন। প্রভাতদাই দেখিয়েছিলেন গ্রন্থাগার আলোকিত নোবেল পুরস্কারের বিদেশী ভাষার বইগুলি।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মোটা লেন্‌সের চশমা চোখে বিনোদদা, স্বল্পবাক্‌। স্বল্পবাক্‌ সুরেন করদার সঙ্গে যেমন দূরত্ব ছিল, তেমন নয়। ওঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। সাহিত্যকার আসরগুলিতে নিয়মিত আসতেন। খুব কম কথাগুলিও ছিল স্নেহ মিশ্রিত। আমি যখন ছাত্রী, ছিলেন অবিবাহিত, পরের বার গিয়ে ওঁকে বিবাহিতই দেখি। খবর পেয়েছিলাম, চোখের আলো নিভে গেছে। কী কষ্টই না হয়েছিল শুনে। চোখেই যে ওঁদের সর্বস্ব। সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য ছবি। Where Eye, দেখলাম সেদিন। অনেকদিন পরে বিনোদদাকে দেখলাম পর্দায়ঃ অন্তর্দেখায় দেখেছেন, সৃষ্টিও করছেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলিই হয়ে গেছে তাঁর চোখ। এত ভালো লাগল দেখে। মনে হোল ঃ বিনোদদার সঙ্গে কথা কয়ে যেন তাঁকে প্রণাম করে এলাম।

রামকিংকর বেইজ

দূর থেকেই দেখেছি, আলাপ ছিল না বেশী। শুনেছি রামানন্দ বাবু আবিষ্কার করে এনে দিয়েছিলেন মষ্টোরমশায়ের হাতে। আলাপ না থাকলেও, ওঁর সেই পায়েস মাথায় নিয়ে চলা সুজাতা, রাস্তার ধারে দাঁড়ানো সাঁওতাল পরিবার, মেয়ে পুরুষ দুজনেরই কাঁধে ভার, বাচ্চা ছেলেটিকে ঝুলিয়ে নিয়েছে মা, সঙ্গের কুকুরটিও পরিবারভুক্ত—ভাস্কর্য দুটি দুপুরের রদ্দুর এলেই মনে পড়ায় রদ্দুরে দাঁড়িয়ে কাঁপছি এখনো। এই ভাস্কর্য দুটিতে ঐতিহ্যের ছাপ বেশী। এ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের আদর্শে গড়লেন কবির মুখ, বাতিদান। বাতিদানের শিখাগুলি উর্ধমুখ, আমার লেগেছে সাহিত্য, সংগীত শিল্পের ত্রয়ী সম্মেলন . চারটি ভাস্কর্যেরই প্লেট দেখতে পাওয়া যাবে ললিত কলা-আকাদেমী প্রকাশিত **Contemporary Indian art series** এর **Ramkinkar** পুস্তকটিতে।

শান্তিদাকে শান্তিদেব ঘোষ নামেই জেনেছি। কানুনমাফিক রবীন্দ্রসঙ্গিতের হাতেখড়ি শান্তিদার কাছেই। তার আগে কলকাতায় এর, ওর মুখে, রেকর্ড মারফৎ। শান্তিদার কাছেই লিখেছি সেই গানগুলি ঃ তালানুগত্য নয়, ভাবানুগত্যই যার মর্মকথা। সেই গান-গুলি—ঢিমে লয়ে, কখন দিলে পরায়ে স্বপনে, অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে ; এই রকম আরো বেশ কয়েকটি। শান্তিদার অধিনায়-কত্বেই বৈতালিক, মন্দির বৈতালিক আর গুরুদেবের কাছে শিখতে যাওয়া সে বছরের বর্ষার একমাত্র নতুন গান ;

এসো এসো, শ্যামছায়া ঘনদিন

সেদিন আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি এই গানটিই হয়ে যাবে গুরুদেবের শেষতম বর্ষাসঙ্গীত।

গুরুদেবের এত স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য খুব কম জনেরই হয়েছে। খুব ছোট বয়সে এসেছিলেন। প্রায় সমস্ত জীবনই কাটছে শান্তিনিকেতনে। শান্তিদা তাঁর সারাজীবন গুরুদেবের গান প্রচারের কাজেই দিয়েছেন। স্বপ্রচারের কথা জরুরী ভাবেন নি। আজকের দিনে স্ব-প্রচার তৎপরতাই প্রবল হয়ে আছে সকলের মধ্যে। এখনো গুরুদেবের গান নিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই সংগী করতে হয় "রবীন্দ্র-সংগীত" আর "রবীন্দ্র-সংগীত-বিচিত্রা" বই দু'খানি। এই দু'খানিতে গুরুদেবের গানের কথা বলেছেন, গুরুদেবের কথা বলেছেন কিন্তু, আপনছায়া ফেলে ঢাকতে চাননি তাদের। অথচ তা হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই।

সংগীতের প্রায় সব মহলেই আসা-যাওয়া শান্তিদার। নাচতেন বলিষ্ঠ, পুরুষের যোগ্য। ওঁর নাচ প্রথম দেখি ছায়া প্রেক্ষাগৃহে ; রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির সংগে। মাষ্টারমশায়েরা স্নেহধন্য ছিলেন। একদিন সংগীত ভবনে বসে বীণা বাজাচ্ছেন, মাষ্টারমশাই যাচ্ছিলেন পাশ দিয়েই, চলে এলেন, বললেন ঃ শান্তি, তুমি কি সংগীতের কোনো দিকটাই বাদ দেবে না। স্নেহে উদ্‌ভাসিত মুখ নন্দলাল বসুর।

গুরুপল্লী স্মরণে এলেই স্মরণ কাঁধ-ছড়ানো চুল সেতারে মগ্ন সুশীলদা —হাসিখুশি বৌদি, যার কাছে মিষ্টি কথা আর বাড়ীর স্বাদ নিতে গেছি আমি, অরুণা, স্মৃতিকণা, কতবার। সেখানে মোহরের সংগেও হয়ে যেত দেখা। সন্তোষদা-গৌরীদি, গৌরীদির কাছে সেলাই আর আল্পনার ক্লাশ নিলেও, আমার বারবার মনে হয়েছে গৌরীদির বিশিষ্ট একটি রূপ দেখা থেকে বঞ্চিত থাকল আমার চোখ, নটীর পূজার স্তূপপাদমূলে নাচটি। শুনেছি সেরকম শ্রীমতী অভিনয় আর কেউ করে উঠতে পারেননি পরবর্তীকালে। বিলুদা, বেবিদি, দীর্ঘাংগী বেবিদি নৃত্যনাট্যগুলিতে পুরুষের পার্টই নিতেন। যমুনাদি ঃ একদার ক্ষীণ দেহটি হারিয়েছেন; তবু গরবা নৃত্যের যূথবদ্ধ নাচে ওঁর পা ফেলবার ভংগীটি লেগেছিল বিশিষ্ট। মাসিমা, কর্মিষ্ঠা, সবলা, মাষ্টারমশায়ের যোগ্য সহধর্মিণী। বাণীদার রাজকীয় কণ্ঠ, সত্যদার স্নিগ্ধ হাসি, সুরেনকরদার গাম্ভীর্য, শুনেছি শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিকল্পনা তাঁরই। সুধাকান্তদা, নির্মলদা, আলুদা। সুধীরকরদাকে একটু বেশী মনে আছে। গুরুদেবের স্নেহস্নিগ্ধস্বরে যিনি—বাঙাল। আর গানেও তাঁর সেই পূর্ববংগীয় টানটি বেশ বেজে উঠত। একথা বোধকরি বলা চলে আজকের দিনে, প্রাক্‌খণ্ডিত বংগে সেদিন বাঙাল কন্যারাই আসতেন শান্তিনিকতনে, বাঙাল এবং প্রবাসী বাঙালী। পশ্চিমবংগবাসীরা থাকলেও বাসিনী ছিলেন খুবই কম। যেহেতু শান্তিনিকেতনে সহপঠন। ডাক্তারবাবুর কথা এতক্ষণ না বলে অপরাধ করেছি। আমাদের সমস্ত আধিব্যাধির মুক্তিদাতা। আমি অবশ্য তাঁর ক্লাশ নিইনি। তবু মনে পড়ে একটি সাইকেলে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করছেন সমস্ত শান্তিনিকেতন।

-মাসিমা

বৌঠান যেমন সকলেরি বৌঠান, তেমনি কয়েকজন মাসিমা ছিলেন আমাদের। শান্তিদার মা, কালীমোহন ঘোষের স্ত্রী একজন, একজন মাসিমা গৌরীদি, যমুনাদি, বিলুদার মা, মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী, আর এক মাসিমা শিশুবিভাগের।

তিনি ও প্রায় সমস্ত হারিয়েই বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ছেলে-গুলিকে। আমাদের সেখানে যাবার তত দরকার ছিলনা, তবু গেছি। পুতুলদি, শৈলনন্দিনী ছিলেন ভাসুর কি দেওরকন্যা। কতদিন পুতুলদির সংগে গিয়ে খেয়ে এসেছি ফুলকফি, নয় তার ডাঁটার চচ্চড়ি। হলুদ, কাঁচালংকা, কালোজীরে ফোড়ন। কী ভালোই লাগত সেই বাঙাল রান্না।

শিশুবিভাগের এক ক্লাশের সংগে আর এক ক্লাশের ফুটবল ম্যাচ। মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছে মাসিমার। খেলার মাঠে যেতে হবে, যে ক্লাশ জিতবে, তারা বল্‌বেঃ মাসিমা, আমরা জিতেছি, তুমি হাস্‌ছো না-যে ?

পরাজিতদের মুখ ম্লান ঃ মাসিমা, আমরা হেরে গেছি, আর তুমি খুশি ?

তাই মাসিমার আকুল প্রার্থনা ঃ ঠাকুর, ড্র হোক্।

মমতা সেন

আর এক মহিলা, গুরুপল্লীর কেউ নন, থাকতেন অবশ্য গুরুপল্লীর পাশেই তাঁকে প্রণাম না জানালে অসমাপ্ত থেকে যাবে এই অধ্যায়। পুরুষের মতোই দৃঢ়, স্পষ্টবাদিনী, সোজা মেরুদণ্ড, যদিও বাহির থেকে দেখতে সামান্য নত লাগত।

আলোচনার ছলে পরচর্চা, ঘৃণা করতেন। আবার নারীর মতই মমতাময়ী। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে তাঁর, তবু স্নেহের অংশভাগ পেয়েছিলাম।

নারীপুরুষের সম্মিলিত সমন্বয় নিয়েই তিনি আমার শ্রদ্ধা পেয়েছেন। আর কেন জানিনে, আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে চরিত্রের এই নারী-পুরুষ সম্মেলন। নারী চরিত্রে এবং পুরুষ চরিত্রেও।

বেশী পড়াশোনার সুযোগ পাননি, তবু পাঠযোগ্য বইগুলিতে মগ্ন হয়ে যেতে পারতেন। বন্ধু ভবানীর মা, আমারো মাতৃসমা মাসিমা।

দেখা-না-দেখা

শান্তিনিকেতনে দেখেছি অনেক, আবার রয়ে গেল অনেক না দেখাও। দেখেছি, যাদের কথা বলেছি তাঁরা ছাড়াও, অন্নদাশংকর, লীলা রায়, অমিয় চক্রবর্তী, হৈমন্তীদি, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, সেদিনের ওমর-খৈয়াম অনুবাদক আর তাঁর স্ত্রী এটাদি।

এটাদি সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছি। গল্পে কিছু অতিরঞ্জন এসেই পড়ে। হয়তো বা আছে কিছু সেই অতি। ইংরেজী চিত্রাঙ্গদা হচ্ছে। নাম তার চিত্রা। বাহির থেকে এক য়ুরোপীয়া মহিলা এসেছেন, তাঁর দেশের ফোক ডান্সের পদক্ষেপ মিলিয়েছেন। তিনিই চিত্রাঙ্গদা। কান্তিদা অর্জুন। এটাদি সিংহসন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলেন অডিয়েন্সে, এতক্ষণ ওখানেই ছিলেন, একদল মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন: আমার কান্টিকে কেমন দেখাচ্ছে? মেয়েরা জবাব দিল: আর তোমার কান্তি? এটাদি এবার তোমার কপাল পুড়ল, অমন সুন্দরী মেয়ে। এটাদি confident—আমার কান্টিকে কেউ কাড়তে পারবে না।

তবে এটা দেখেছি: ক্লাশ সেরে ফিরছি, এটাদি দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আসছে বোলপুরের দিক থেকে। মেয়েদের সমবেত উচ্চস্বর:

এটাদি কোথায় গিয়েছিলে?—গিয়েছিলাম বোলপুরের বাজারে কুচোচিংড়ী কিনতে। কান্তি পুঁইডাঁটায় কুচোচিংড়ী খেতে খুব ভালোবাসে। কিছু মনে কোরনা, থামলাম না বলে, পরে কথা হবে। সাইকেল চালাতে চালাতেই কথা বললেন। বিদেশিনী টান ছিল বাঙলায়, আমাদের খুব ভালো লাগত শুনতে।

লীলা রায়কে দেখেছি আর এক চেহারায়। পিয়ানো বাজনাও শুনেছি। শুনেছি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তিনি সুনিপুণা। আবার বাড়ীর ভৃত্যদের কখনো চাকর বলতে শুনিনি, বলতেন—ওরা আমার ছেলে। বেশীর ভাগ পরতেন লাল পাড়ের খদ্দর শাড়ী, পায়ে আলতাও দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব ঘরোয়া মাতৃমূর্তি। কিন্তু, পিয়ানো বাদনরতা যে মহিলাকে দেখলাম ঃ তিনি পুরুষ কি নারী মনে পড়েনি, মনে হয়েছিল শিল্পী। একটু বলে নিই ঃ সেদিনের সেই য়ুরোপীয়া কন্যা, ভারতীয়া স্ত্রী লীলাময়ী রায়, হৈমন্তী চক্রবর্তী, এটা ঘোষ, আমি এঁদের দেখেছি শ্রদ্ধেয়া।

না-দেখা

দেখলাম না কত। দেখলাম না এণ্ডরুজ, সিল্‌ভা লেঁভা, এল্‌মহার্ষ্ট। শুনলাম না গুরুদেবের সব গানের ভাণ্ডারী আর কাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথের উদাত্তদরাজগলার গান। যদিও শুনেছি সেকেলের টেক্‌নিকে রেকর্ডিং তাঁর গান ঃ আমার মাথা নতকরে দাও হে তোমার চরণ ধূলোর তলে। কিন্তু, সামনে বসে শোনা আর রেকর্ড শোনার মধ্যে মস্তবড় ফাঁক থেকেই যায়। শুনলাম না, খুকুদির (অমিতা সেন) জোরালো কণ্ঠ, গুরুদেবের সব স্বরলিপিই যাঁর থাকত কণ্ঠস্থ। প্রথম নোটেশান পড়তে শিখি তাঁর 'আধেক ঘুমে নয়নচুমে' গানটি দিয়ে। রেকর্ড আনিয়েছি, ওদিকে বোধকরি প্রবাসীতে বেরিয়েছে স্বরলিপি, শান্তিনিকেতন যাবার অনেক

আগেকার কথা। শুনলাম না, নুটুদি অর্থাৎ রমা করের সুরেলা স্বর।

দেখলাম না অবনঠাকুর, যাঁর তুলি কলম চলত দুই সমান তালে। শুধু তাই নয়, গল্প বলার জুড়ি ছিল না তাঁর। শুনলাম না সেই গল্প বলার রাজার গল্প বলা। দেখলাম না তাঁর অভিনয়। শুনেছি, অভিনয়ের চরিত্রে মিশে যাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর, যা কিছুতেই হোতনা রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ সবচরিত্রেই রবীন্দ্রনাথ।

আর প্রমথ চৌধুরি, বাঙলার বীরবল, সবুজপত্রে যিনি আনলেন কথ্যভাষায় ধার, বুদ্ধির শানে শানানো। ছবিনয়, বিজ্ঞাপন নয়, শুধু সাহিত্য। প্রবাসীর রামানন্দ বাবুর পরেই যিনি সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আদায় করেছেন অনেকখানি। যদিও রামানন্দ বাবুর মতো ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল না, সবুজপত্র বার হোত ঘাটতি তহবিলে, তাঁর নিজের অর্থের অনেকখানি দিয়েই বার কোরতেন সবুজপত্র। বই কেনায় যাঁর শখ প্রায় passion; যাঁর লাইব্রেরীর অনেকখানি এসে গেল শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে। দেখলামনা তাঁকেও।

আমার ক্ষোভ রয়ে গেছে বিবিদির পাশাপাশি একদিনও দেখিনি বলে। দেখলে দ্বৈত জীবনের আর একটা ছবি নিশ্চিত মনের পর্দা জুড়ে জ্বল্‌জ্বল্ করত। কিছু কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "চলমান জীবন" বইটিতে। সে সময় তিনি ছিলেন কর্মোপলক্ষেই চৌধুরী পরিবারের অতিথি। দেখলে নিশ্চিত ওই স্তব্ধ, অতল জলাশয়টিকে আমি অন্য চেহারায় দেখতাম। দেখতাম :

ঢেউ দিয়েছে জলে
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল, ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।

বিবিদি

"যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর ?"

যা হারিয়ে যায় তাই আগলে বসে থাকা, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। রবীন্দ্রসহোদর পুত্রী, চিনিয়ে দিতে হোতনা কাউকে। কনকচাঁপা আভায় গরদশাড়ী, লিওনার্দো ছবিভঙ্গি বা অবনঠাকুরের টেনে, বিপরীত কম্বিনেশন নয় গগনেন্দ্রনাথের সাদাকালোর, একটি রঙ বিচ্ছুরিত নানা আভায়, একটি রাগ বিস্তারিত সুরের মেলডিতে। তন্বী, দীর্ঘকালোপদ্মচ্ছায়ে ছায়াধরা ঘনতর চোখ, অতল জলাশয়, ব্যথা ডুবে আছে স্রোতের গভীরতমে।

শ্যামলীতে থাকতেন। প্রমথ চৌধুরী নেই, আছে তাঁর চিঠিপত্র, অল্পস্বল্প বই, লেখার খাতা। বিরাট লাইব্রেরীর কিছুটা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কিছুটা দিয়েছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: তোমাদের এবারকার বিজয়ার প্রণাম। বিবিদির কাছে ছিল একান্তই পার্সোনাল কিছু। কতবার দেখেছি বইগুলি, খাতাগুলি হাত বুলিয়ে চলেছেন ধুলোঝাড়ার ছলে। চুপ্ করে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আমার মনে হয়েছে, বিবিদি এখন নেই এই নিভৃত নির্জন শ্যামলী কক্ষে। চলে গেছেন ব্রাইট ষ্ট্রীটের ঝল্‌মলে বাড়ীতে। যেখানে প্রতিদিন-রাত্রি প্রমথ চৌধুরীর উপস্থিতি। সবুজপত্র যুগের সেই আনন্দমুখর সন্ধ্যাগুলি। বস্‌ছে সাহিত্য বৈঠক। প্রবীণ আর তরুণ অথচ মননশীল লেখকদের আনাগোনা। আসছেন নাটোরের জগদীন্দ্রনারায়ণ, অন্নদাশংকর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যেন রোদনষ্টাইন বৈঠক। আর আছেন রবিকা, আনন্দের দমকা হাওয়া ছড়িয়ে, একাই একশ। সাহিত্যালাপ কবিতা, আবৃত্তি, গান, নাটোরের পাখোয়াজ সংগত, নিজের

পিয়ানো। উজ্জ্বলতম সেই মুহূর্তগুলিতে বাল্মিকী-প্রতিভার বীণা-পাণি সরস্বতী বিবিদিকে মননশীলা হয়েও মধুর জোগান দিয়ে চলতে হয়েছে মধুময়ী গৃহকর্ত্রীরূপে। আবার কখনো মনে হয়েছে এখনো নীরব নন, নীরবতমা নারীটি : মগ্ন আলাপ চারিতে। হয়তো গেয়ে চলেছেন অশ্রুতকণ্ঠে : ওই বই, ওই খাতা, ওই চিঠিপত্রে হাত বুলোতে বুলোতে :

আমার যদিই বেলা যায়গো, যায়গো বয়ে। যদিই বেলা
জেনো জেনো আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে। যদিই বেলা
আমি আসতাম শখ ফ্রেঞ্চ শিখব।

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম শুনেছি মুগ্ধ। কোনো কঠিন গানের কলি শুনতে বসে ভেবেছি, ওঁর গলায় বয়েসকালে ছিল অজন্তার শিলারঙ।

আবার অনেক সময়ই এসেছি ছলভরে।

স্তব্ধ, জলাশয় ব্যাথাতুর গভীর ; গভীর অথচ নৈঃশব্দ, আমাকে আনত টেনে।

বৌঠান

ওরা পরকে আপন করে, আপনারে পর
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।

বোধকরি পিতৃগৃহ ছেড়ে কন্যা যখন স্বামীগৃহে যান, তখনি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই গান। তেমনি একদিন বৌঠান ও এলেন তাঁর মা-বাবার ঘর ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের ঘরে। "বাবামশায়" বলতেই গলায় মধুক্ষরণ। জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়েই "বাবামশায়।" আমি যখনই শুনেছি, মনে হয়েছে পিতাবৎ অপেক্ষা পুত্রবৎ। যদিও এই নিঃসন্তানা মহিলার পুষ্যি ছিল নন্দিনী। চেহারায় ঠাকুরবাড়ীর কাঞ্চনআভা অপেক্ষা রক্তিমাভার দিকে ঝোঁক, ছিলেন ঠাকুর বাড়ীরই

কন্যাবংশীয়া। অসুস্থ থাকতেন প্রায়ই। এও জানি, ব্যথা সর্ব জীবনেরই সহচর, বেদনার যে অংশটিই তাঁর থাক্, মুখের হাসি ছিল স্নিগ্ধ। আমি তাঁকে, দেখেছি মাতৃরূপের গলিত নির্ঝর। আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন বই "নির্বাণ", গুরুদেবের সমাপন শেষে লেখা, নিজের হাতে লিখেছিলেন, "স্নেহের নমিতাকে"। হাতে নিয়ে বই স্তব্ধ, ভেবেছি, মাতৃরূপের উজ্জ্বলতম অংশ শোকে শুষ্ক। ভেবেছি, বৌঠানের গুঁড়ির অনেকখানিই হয়ে গেল অকেজো, অনেক সূক্ষ্ম শেকড় গেল মরে, অনেকটাই নীরস পত্রঝরা হয়ে গেল গাছটি।

বৌঠানকে শেষ দেখেছি ১৯১৬ কি ১৭ সালে। একবেলার মতো গেছি। পরিচিতদের মধ্যে মোহর আর বীরেনবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ; উভয়ের বই বিনিময়। আর উত্তরায়ণে দেখা বৌঠানকে। খুব বৃদ্ধা হয়ে গেছেন, যাব কি যাবনা ভাবছি, সহচারিকা এসে বললেন; আপনাদের ডাকছেন। প্রণাম করতে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ,—"খুব চেনা চেনা লাগছে তোমাকে।" আমি বললাম—"আমি নমিতা।" উৎসাহে বসালেন আমাদের, আমি, আমার স্বামী, ননদকন্যা উৎসা। কিছুক্ষণ আলাপচারী। দেখলাম, বাবামশায় নেই, রয়ে গেছে বাবামশায়ের ইচ্ছেটা। তেমনি সাজানো বোয়াম থরে থরে। টফি, লজেন্স, চকোলেট। নিজে হাতে করে বার করে দিলেন উৎসাকে, আমাকে, তারপর হাত ডুবিয়ে আবার মুঠোভরে হাত দ্বিধান্বিত। একবার এগিয়ে আসছে তাঁর দক্ষিণ হাত, আবার যাচ্ছে পিছিয়ে। আমি বললাম—"দিন না।"

—"জামাইকে, চকোলেট—লজেন্স—"ভারী কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর। হেসে বললাম : উনিও তো আপনার আশীর্বাদযোগ্যই।

স্বামী হাত বাড়ালেন, দিয়ে খুব খুশি। সেই শেষ দেখা।

রথীদা

রথীদার সঙ্গে পরিচয় বেশী ছিলনা। সেবার সাহিত্যকার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি পড়েছিলাম একটি গল্প, জয়শ্রীতে ছাপা হয়েছিল। আরো কয়েকজনের লেখা ছিল রবীন্দ্র ঘটক চৌধুরি, আরো কেউ কেউ। শেষে সভাপতির ভাষণে আলোচনা করেছিলেন স্বচ্ছ। গল্প লেখার জন্য আমাকে পড়তে নির্দেশ দিলেন মোপাসাঁ আর চিখভ।

মীবাদি

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে, হেরে মাধুরী।

মীবাদি যেন লুকিয়ে থাকা আঁকাবাঁকা ঝিলমের স্রোতখানি।

যদিও চেহারা বিপরীত।

আমার সবসময় মনে হয়েছে জনসমাগমের পিছনে নিজেকে আড়াল রাখতে ব্যস্ত। বাবা মশায়ের কাছেও বৌঠানকে ছেড়ে দিয়ে অগ্রভাগ নিজে থাকতেন পিছনে অন্তঃসলিলারূপে। রবীন্দ্র কন্যা হিসেবে কখনো এগিয়ে আসতে, আমি অন্ততঃ দেখিনি।

বুড়িদি

নদী আপনবেগে পাগলপারা

বিপরীতে কন্যা নন্দিতা কৃপালানি। সব সময়ই সমুখে। নাচে, গানে, পিক্‌নিকে সৌমেন ঠাকুরের সঙ্গে পলিটিক্সের তর্কালাপে, ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল। দাদামশায়ের প্রতি প্রেমের প্রকাশ, বৌঠানের বাবামশায়ের মতই। কিন্তু, বেশী দুর্ধষ। এখনো উজ্জ্বল, বুড়িদির ভালোবাসার দুর্জয় স্বরূপ। সেদিন সিংহসদনে গান ঃ

"মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ?"

পুরানো গানের প্রেমে গুরুদেব গলা মেলালেন গায়িকার গলায়। শেষ বয়সে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর মধ্য বয়সের গানের সঙ্গে। আশী বছরের গলা, কোথায়ো বা গেল কেঁপে, কোথায়ো বা ভেঙে। অর্বাচীন কেউ কেউ, বয়সেও বালক-বালিকা, উঠেছিল হেসে। বুড়িদির বুকে ঢেউ। দুর্জয় প্রেম ভেঙে পড়্‌ল দুর্ধর্ষ ক্রোধকণ্ঠে—

—থামো তোম্‌রা।

বুড়িদির মধ্যে বেশ ছিল একটা রাজেন্দ্রানী রাজেন্দ্রানী ভাব, যদিও সুন্দরী ছিলেন না। শ্যামা বলতে বুড়িদিকেই মনে পড়ে, চণ্ডালিকার প্রকৃতি মানেই নন্দিতা কৃপালানী। বুড়িদির চিত্রাঙ্গদা রূপটি আমার দেখা হয়নি। শ্যামার মধ্যে যে রাজনর্তকীর রাজ্ঞীভঙ্গী আমার মনে হয়েছে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির জাতও সেই জাতেরই—সেই বলতে পারে, অসংকোচে, কেন দেব ফুল? বলতে পারে, ঘৃণা করি রাখিবে মোরে, সে নহি আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী। তিন নায়িকার মধ্যে ক্যারেক্‌টারের।

কৃষ্ণ কৃপালনি

রাজবৎ আকৃতি এবং বোধকরি প্রকৃতিও ছিল কৃষ্ণ কৃপালানির। দীর্ঘ, সুদর্শন, গৌরবর্ণ এবং সৌম্য। বুড়িদির পাশে যখন হাঁটতেন মনে লাগত; শম্ভুর ইন্দুবালা কেশগুচ্ছে বাঁধতে চাইছেন উজ্জ্বলা গঙ্গাকে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে বিশেষ জানতে পারিনি। পরবর্তী জীবনে পড়ি তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথ: এক জীবনী। হিন্দী অনুবাদটাই পেয়েছি হাতের কাছে, তাঁর লেখা ইংরেজী বই, যোগাড় করে উঠতে পারিনি।

প্রায়-চরিত্র। মানব চরিত্রের মতোই প্রায় চরিত্রগুলি।

বৃষ্টিভেজা এক চরিত্র 'শান্তিনিকেতনের'। যে না ভিজল শান্তিনিকেতনে, সে স্বাদই পেলনা। সেদিন দুপুরে বৃষ্টি ঝরতেই আমরা মোটা মোটা তোয়ালে জড়িয়ে বেরুলাম। ওদিক থেকে বুড়িদি বেরিয়ে গান ধরেছেন :

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।

আমরা ছেলেরা, মেয়েরা বাচ্চারা সব মিলিয়ে গলা চলেছি।

ওরে বৃষ্টিতে মোর লুটেছে মন, ছুটেছে ওই ঝড়ে
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গদল কাহার পায়ে পড়ে ?

দূর থেকে জল ছুটে আস্‌ছে গেরুয়াধারা, আমাদের পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খিল্ খিল্ হেসে দ্রুত দৌড়।

আমরা গাইতে গাইতেই ফিরলাম শ্রীভবন।

তারা সেদিন প্রথম এসেছে, চক্রবর্তী বা চৌধুরী। ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক। ছিপছিপে চেহারা, বড়ো তীক্ষ্ণ চোখ, চশমার মধ্যে প্রতিফলিত ধারালো। কিন্তু, ঠোঁটের হাসিটি মিষ্টি। হেসে বললঃ এরপর আমিও ভিজব আপনাদের সঙ্গে।

প্রথম পরিচয়ে সে সময় আপনি বলারি রেওয়াজ ছিল। তারপর নামত তুমিতে, তুই সম্বোধন খুব প্রীতি ছাড়া সম্ভব ছিলনা। ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে তারাকে টেনে নিয়ে আমরা চলেছি রান্নাবাড়ী। সরোজিনীদি (আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম) পাহাড় প্রমাণ পাঁপড় ভাজাচ্ছেন, বিরাট বিরাট ডেক্‌চিতে টগবগিয়ে ফুটছে চায়ের জল। ভিজে এসেই তো ছেলে মেয়েরা খাবে ভাজা পাঁপড় আর গরম গরম চা। নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আমরা এবার বৃষ্টির গান থেকে চলে গেছি চায়ের গানে। দল বেঁধেই গাইছি ঃ

হায় হায় হায়, দিন চলি যায়
চা-স্পৃহ চঞ্চল, চাতক দল চলো, চলো চলো হে
টগবগ উচ্ছল কাথলি তল জল কলকল হে
এল চীন গগন হতে   পূর্ব পবন স্রোতে
শ্যামলরসধরপুঞ্জ
শ্রাবণ বাসরে   রস ঝর ঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ, দলবল হে ॥

খেলা

খেলা শান্তিনিকেতনে লেগেই থাকত। কলেজের, স্কুলের, ছেলেদের, মেয়েদের। বাহির থেকে খেলতে আসতেন অনেক কলেজ। আমরা ভাগ করে উৎসাহ দিতাম—এগিয়ে—এগিয়ে। বেশীর ভাগ অতিথি খেলোয়াড়দেরই করতাম উৎসাহিত।

লক্ষ্ণৌ কলেজ থেকে এসেছে মেয়েরা, সুগঠনা, দীর্ঘাংগী। ম্যাচ বাস্কেট বল। আমাদের মেয়েদের অনেকেই বেশ খাটো খাটো। সুষমা মাংগলিক বললঃ "আমাদের কপাল এবার পুড়বে।" শিশু বিভাগের ছেলেমেয়েরা লেবুর টুকরো নিয়ে ঘুরছে। ফাঁক পেলেই দিয়ে দিচ্ছে খেলুড়ীদের হাতে। বেশীর ভাগই চলে যাচ্ছে লক্ষ্ণৌএর দিকে। খেলায় হারি জিতি, ক্ষতি নেই। সৌজন্যে যেন না হারে শান্তিনিকেতন।

কিন্তু, সেবার জিৎ দুদিকেই, সৌজন্যে এবং খেলাতেও। লম্বা, লম্বা মেয়েগুলির হাত থেকে বল লুফে লুফে নিয়ে আমাদের মেয়েরা গোলের পর গোল করতে লাগল। ওদের পরাজয়ের সূচনাতেই আমরা উৎসাহদানে বিরত হয়ে একেবারে চুপ।

পিক্‌নিক্‌

মাঝে মাঝে চলে যাওয়া গ্রামে। কুটনো, রান্না, পরিবেশন নিজেদের হাতে। খাওয়া, খেলা, গান। কখনো পুরো শান্তিনিকেতন একত্রে। কখনো বা পৃথকভবন, শিক্ষাভবন, পাঠভবন। সংগীত ছিল কলার সংগেই মিলে। সন্ধ্যায় ফেরবার মুখে গান: আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা, কিংবা "আমাদের শান্তিনিকেতন।"

দূরযাত্রা হোত মাষ্টারমশায়ের অধিনায়কত্বে অজন্তা, এলোরা। অনিলদার অধিনায়কত্বেও যাওয়া হোত দূরযাত্রায়। সংগীত-কলার পিক্‌নিকে যেমন শান্তিদার উৎফুল্ল কণ্ঠ বাজতে থাক্‌ত, মাষ্টার-মশায়ের অজস্র স্কেচ ঝরে পড়ত কার্ডে কলেজের পিক্‌নিকে তেমনি বাণীদার ভরাট গলারা পাশাপাশি শৈলজাদার মৃদুকণ্ঠের গান আর অনিলদার উচ্চকণ্ঠের হাসি।

বৈতালিক

সকাল-সন্ধ্যা উপাসনা, সকালের বৈতালিক, সঙ্গীতভবন, কলাভবন, শিক্ষাভবন, পাঠভবনের সাপ্তাহিক বৈতালিক, মন্দির বৈতালিক ছাড়াও ছিল অন্য।

মন্দির বৈতালিক আমরা বলেই গেয়েছি গান। লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান, অন্য বৈতালিক চরৈবেতি। অর্থাৎ চল্‌তে চল্‌তে চল্‌তে। প্রথম শরৎ ভোরে শৈলজাদার অধিনায়কত্বে

"আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি,
তাই ভোরে উঠেছি।"

ফেরবার পথে: "ওগো শেফালি বনের মনের কামনা।"

সেদিন পূর্ণিমা। সঙ্গীতভবনে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং। আমরা সমবেত সঙ্গীতভবনে। শান্তিদার অধিনায়কত্বে সমস্ত শান্তিনিকেতন পরিক্রমা পূর্ণিমায় প্রথম রাত্রে। উত্তরায়ণের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গান ঃ আমরা সকলেই জানি এ গান শুনছেন গুরুদেব ঃ আমাদের গলায় প্রাণের জোয়ার

"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ-সুধা ঢালো॥"

অটোগ্রাফ

অটোগ্রাফের শখ ছিল না কোনো কালে। আমি সঞ্চয় করিনি কোনো কালে কোনো অপরিচিতের লেখন। তা তিনি যতই নামী হোন।

শান্তিনিকেতনে অনেকে কেউ কেউ খুব পারত জোগাড় করতে; শুধু নিজের নয়, একগাদা অপরের অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে লেখা বা সই নিয়ে ফিরত। আসতেনও তো অনেকেই দেশবিদেশের নামীজনেরা। পাহাড়-প্রমাণ বোঝা নিয়ে অনেকেই অনেকদিন আমাকে বলেছে ঃ দাও তোমার খাতা। বলেছি ঃ নেই আমার।

বিস্মিত হয়ে গেছে চলে।

শিল্পী জুঁপেঁয় চলে যাচ্ছেন চীনে। শান্তিনিকেতনে ছিলেন কিছুদিন। আমরা প্রণাম জানাতে গেছি, বিদায় প্রণাম। কথা বলছেন ঃ অধ্যাপকদের সঙ্গে, তাঁরাও এসেছেন বিদায় অভিবাদনেই। পাশেই রাখা একতাড়া সাদা কার্ড। কথা বলতে বলতে মুহূর্তে মুহূর্তেই এক একটি স্কেচ। চেয়েও দেখছেন না, চোখ উঁচু করে কথাই বলে চলেছেন। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। যারা প্রণাম করছে, তাদেরই দিচ্ছেন এই আশীর্বাদ। যা তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

আমার আগের মেয়েটি পেল ছুটন্ত ঘোড়া। অল্প কয়েকটি

রেখাতেই ধাবমান পেশীরা। পরমুহূর্তেই আমি—পাতাঝরা স্তব্ধ, এক বৃক্ষ। তার নিরাভরণ আঁকা-বাঁকা ডালগুলি ঊর্ধে ওঠানো, সেই নিরাভরণেই সুদূরের পিপাসা।

শ্রীভবনে ফিরে এলে হায় হায় করে উঠলো প্রমীলাদি। অসুস্থ তাই পারেনি যেতে। প্রমীলাদিকে আমার বেশ ভালো লাগত। জানিনে, ওর কোনখানে বিঁধেছিল এক ব্যথা, গলায় সুর ছিল না ঃ অথচ গাইত বেশ একটা কঠিন গান। বেসুরো সেই গান শুনে অনেকে হাসলেও, আমি ওর ব্যথার রূপটাকেই দেখতে চেয়েছি। গাইত ঃ

যদি হায়, জীবন পূরণ নাই হল মম, তব অকৃপণ করে।

আমি একটুক্ষণ ভাবলাম, গাছটির দিকে দেখলাম আর প্রমীলাদিকে। কার্ডটা বাড়ালাম ঃ নাও তুমি।

প্রমীলাদি অবাক ঃ আর তোমার ?

—ওটা রয়ে গেল আমার মনে। সেটাকে কেউ কাড়তে পারবে না।

প্রমীলাদি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

জুঁপেঁয়র সেই ছবি সত্যিই রয়ে গেছে আমার মনে। বৃক্ষ বনস্পতি, বৃক্ষ মহীরূপ, অথচ সেই বৃক্ষই হয়ে যায় পাতা ঝরানো নিরাভরণ, তার ডালগুলি উঁঠিয়ে ঊর্ধে সে চায় সূর্যের আলো, আকাশের হাওয়া, তার ডালগুলিতে আসুক কিশলয় ঃ আবার হয়ে উঠি বৃক্ষ বনস্পতি।

নিরাভরণকে দেখেছি উদিচীতে। একটি টানাদেওয়া খাট, লেখবার টেবিল একটি, বসবার চৌকি আর খান কয় মোড়া শান্তি-নিকেতনের চামড়ার কাজকরা। খাটের টানায় থাকত তখনকার ব্যবহারের মতো বই, কাগজপত্র। পার্সোনাল লাইব্রেরী যতদূর মনে পড়ে অনিলদার জিম্মেদারীতে। নিজে থাকতেন খুব কম আস্‌বাব পত্রে। আস্‌বাব পত্রের বাহুল্য পীড়া দিত রবীন্দ্রনাথকে।

আস্‌বাবপত্র সে তো প্রয়োজন সাধনের বস্তু। অবজেক্‌টিভ, সাব্‌জেক্‌ট নয়। তাছাড়া ওর নিজস্ব চরিত্র বলতে কিছুই নেই, অনেকটাই character less. তাই আস্‌বাব পত্রকে কিছু স্বরচিত সজ্জায় সাজিয়ে একটু নতুন বা পৃথক করে তুলতে চান অনেকেই, বিশেষত মেয়েরা। একটু কারুকলায় সাজিয়ে নিয়ে নিজের রঙে রঙানো। আমার মনে হয়, মন্দ নয়, কিন্তু, যে অনুপাতে শক্তি ক্ষয় অনুপাতমাফিক প্রাপ্তি নেই। আজ, কাল, পরশু ওরা নতুন কিছু পারেনা দিতে। যেমন নতুন করে দিতে পারে প্রাণ অথবা প্রাণ-পুঞ্জিত শিল্প। রোজ সূর্য ওঠেনা একরকম করে। ছোটগাছ বৃক্ষ হয়ে ওঠে, লতা পত্রপল্লবে হয় পূর্ণা, গাছ ফোটায় ফুল, ঝরায় পাতা ফের ভরিয়ে দেয় কিশলয়ে গাছগুলি। সূর্য অস্ত ও যায় দিগন্তকে একটু নতুন রকমে রঙিয়ে, ঠিক কাললের মতো করে নয় আজ। কোনো দিনই ফেরানো যায় না। প্রকৃতি নিত্য নবীনকে দেয়—আর দেয় শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, হৃদয়বান মনীষীরা যাঁরা প্রকৃতির মতই উদার প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের, জীবন সময়ের চারপাশ থেকে এই অতিবস্তুত্বটাকেই ফেলতেন ঠেলে, বারবার একথা মনে হয়েছে আমার। গরমে পাহাড়ে যেতেন চলে। কিন্তু, যতদিন না গেছেন

খোলা দরজা-জানালাতেই কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনের প্রায় সাঁওতালী দুপুর, আশীবছর বয়সেও দরজা-জানালা বন্ধ করে পাখার হাওয়া খেতে আমি দেখিনি। খোলা জানালার ধারে আছেন বসে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি বেশী দেখেছি নিরাভরণ ঘরটিতেই। বহিরাগতদের উত্তরায়ণের বড়ো হলঘরে বা বারান্দায় অভ্যর্থনা জানালেও কাছের মানুষগুলি যেত উদিচীতেই—। বর্ষামংগল উৎসবের শেষ মহড়া হলঘরে হলেও, আমাদের বাংলার সব ক্লাশগুলিই হয়েছে উদিচীর নিচের ঘরে। দোতলায় একখানি ঘর, একখানি ঘর তার নিচে, পূবমুখে দাঁড়িয়ে উদিত আলোয় জ্বল জ্বল জ্বলছে ঃ এই আমাদের উদিচী। রবীন্দ্রনাথকে উত্তরায়ণে দেখেছিলাম পড়ন্ত বেলায়, উদিচীতে দেখেছি সকাল বেলায় দেখেছি অনেক মধ্যদিনের দুপুরে ; আবার সন্ধ্যাতেও দেখেছি। যতবার দেখেছি মনে হয়েছে, নিরাভরণ আকাশের পূবদিক থেকে উদিত পশ্চিমে অস্তমিত সূর্য্যের মতই জীবন্ত, জ্বলন্ত, মনোহর।

আমাদের কালের আগেই কথা রটেছিল শান্তিনিকেতনী অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের ষ্টাইল। ওঠা বসা, চলা, ফেরা, কথাবার্তা, গান-গাওয়া ছাড়াও শাড়ী, ব্লাউজ, চপ্পল, পার্স, পর্দা, বেডকভার, মোড়া, ইত্যাদি গৃহসজ্জাতেও। আসলে বস্তুটা ভুঁইফোঁড় কিছু নয়, সর্ব-ভারতীয় জীবনযাত্রার ঢঙ্ এসে শান্তিনিকেতনের মোড়কে মুড়ে নতুন রকম হয়ে যেত। মারাঠিনীদের কনুই পর্যন্ত নেবে আসা চোলির হাত অথচ ফিটিং, হয়ে গেল শান্তিনিকেতনী ব্লাউজ, গুজরাটের কাচের কাজ, কাঠিয়াবাড়ের স্টিচে ঘেরা যা একটু মোটা রঙে মোটা ঢঙে দেখিছি গুজরাটের গোপ-গোপিনীদের কুর্তা আর ঘাগরায়, এসে গেল মেয়েদের ব্লাউজের হাতে, গলায়, পিঠে, নীচের পোষাকে খুব চওড়া করে ঘাগরার নিচু দিকে। জাভা থেকে বয়ে আনা বাটিক, কলাভবনের রঙে, ডিজাইনে মোমের সংমিশ্রণে ঝলমলে অথচ সুগম্ভীর রূপে দেখা দিল। যাকে বলা যেতে পারে, সোব্রাইটি। সেজেছি, অথচ সাজিনি। এমনকি বাংলার কাঁথা, আলপনা, সব গ্রাম্যকলাগুলি শুধু ধরে রাখা নয়, নতুন রূপ দেওয়া।

এখন যেমন সাজানো হয় শাড়ী প্রদর্শনীতে শাড়ীগুলি ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে খরিদদারদের মন লোভানোতে, ঠিক্ মনে নেই কোন সময়, তেমনি সিংহসদনের ওই মস্তবড় হলটাকে সাজানো হয়েছিল বাটিকের কাজকরা শাড়ী, কাশ্মিরী শাল আর ছেঁড়াকাপড়ের ঢাকাই কাঁথায়। মনে পড়ে, ভিড় ছিল ঢাকার কাঁথার দিকেই।

শান্তিনিকেতনে যা এসে পড়ত, তার রঙ্ যেতো বদলে। ঠিক্ সেই প্রদেশের হয়েই তা থাকত না। কথাকলি, মনিপুরী নাচ ও রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে যুক্ত হয়ে হোত অন্যতর। এমনকি গুজরাটের গরবা যা পরে দেখেছি—নবরাত্রি উপলক্ষ্যে। চৌমাথায় অম্বাজীর

ঘট বসিয়ে অম্বাজী গরবে নাচ। বাড়ীর বধূ, কন্যা, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা একশো, দুশো বা ততোধিক মহিলার সম্মেলনে। হাতে তালি দিয়ে, অথবা কাঠি বাজিয়ে অম্বাজীগরবে গরবা। গণপতি পূজা উপলক্ষ্যে মারাঠী পুরুষদেরও গরবা দেখেছি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। দুটিকেই মনে হয়েছে লোকনৃত্য। অথচ শান্তিনিকেতনে সেই নাচই হয়ে গিয়েছিল অন্যরকম। পূর্ণিমার রাত্রে খোলা আকাশতলে মাটি নিকিয়ে মস্ত আল্পনা। চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। মস্ত বড় বড় কলস। বহুছিদ্রেভরা, পাশাপাশি নয়, উপরে উপরে সাজানো হোল তিনটি প্রথম আর তৃতীয়ে জ্বেলে দেওয়া হোল প্রদীপ, দ্বিতীয়টিতে ধূপদান, ছিদ্রদিয়ে বার হচ্ছে স্নিগ্ধ আলো, ধূপের ধোঁওয়া গন্ধ ভরিয়ে চারিদিকে ছড়াচ্ছে সৌরভ, গানের দল ধরেছে গান—গানের তালিম দিয়েছিল গুজরাটের সুশীলা আষাঢ়। গানের প্রথম লাইন, হয়তো ভুল থেকেও যেতে পারে, যারা গুজরাটের মাফ্ করবেন :

সখি, রমিনে রমিনে আয়ো রাস রংগনা

নাচের দল গোল হয়ে ঘিরে ধরল মস্ত আল্পনা। একটি পুরুষ, একটি নারী, এমনি ভাবে। সেজেছিল মেয়েরাই। দীর্ঘাংগী মেয়েদের চুল চূড়ো করে কাটা, ললাট উন্নত করা, তারা সেজেছে পুরুষ। যারা মেয়ে সেজেছে তাদের মুখ মিলিয়ে কেশসজ্জা। তারা যেন উঠে এসেছে অজন্তা থেকে, কোণারক থেকে, খাজুরাহো থেকে। কারুর নতকবরী, কারুর পাশঘেঁষা, কেউ বা এলায়িত বেণী। চন্দনের চিত্রলেখা কপালে গালে। হাতের কাঠিদুটি মোড়া হয়েছে রঙীন কাগজ, মুখের দিকে বাঁধা হয়েছে ঘুঙুর, তালে তালে বেজে উঠ্ছে গানের দলের মন্দিরার তালে।

স্বপ্ন লোকের মত লেগেছিল সেই গরবা-নৃত্য। যেন চলে গেছি কোন সব কালে হয়তো বা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাসদের কালে ;

এরে হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির

হয়তো বা চলে গেছি কোন এক দেশে নীল যমুনার তীরে কিংবা—কিন্তু, কোথায়ো যাইনি। আছি বর্তমান দেশকালেই, স্থান শান্তিনিকেতন পাশে বহা কোপাই, নদী অথচ নদী নয়, সময় ১৯৩৯ বা ১৯৪০ সাল। স্বপ্ন লোকটির সৃজন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আর আমাদের মতো ছাত্রছাত্রী সমন্বয়ে।

এই শান্তিনিকেতনকে আমরা দেশময় ছড়িয়ে, ছিটিয়েদেব চিন্তাটিকে বহন করেছি জীবনভর। কেউ হয়তো নাম করতে পেরেছি শিল্পে, সংগীতে, অভিনয়ে, সাহিত্যে, কেউ পারিনি। তবু জীবন অন্তরতমে বহেছে এর ধারা। ঠাকুর-পরিবারের আলোকে যেমন অনেক বড় আলোতে রূপান্তরিত করলেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি শান্তিনিকেতনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো শান্তিনিকেতনের বাইরে। মনে পড়ে করিয়েছি বর্ষামঙ্গল। অন্তঃশীলা চিন্তায় ছিল গরবার স্বপ্নটি। মস্তবড় আলপনা স্কুলের হলঘরে জোড়া ময়ুর নৃত্যপর নৃত্যপরা, কলাপ বিস্তার করেছে অর্ধ-চন্দ্রাকারে, বসানো হয়েছে তিনটি কলস ছিদ্রভরা, দীপ-ধূপের সম্মেলনে আলোর ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে ধূপের ধোঁওয়া, পিছনে নীলপর্দা উড়ন্ত হংসবলাকা, সেই আট দশটি হাঁস শাদা কাগজ কেটে তৈরী নয়, বেলকুঁড়ির পাঁচশ হাত মালা গাঁথায়। আলপনা দিয়েছিলেন আমার বান্ধবী এখন কোনো স্কুলের কর্মদক্ষা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। আর যারা ছিলেন সকল কর্মের সংগিনী, নাচ, গান, সজ্জা, কেউ কলেজ অধ্যাপিকা, হস্‌টেল্ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট কেউ বা গৃহিনী। আমার কাজ ছিল সংযোজনের। কোনো বৃদ্ধামহিলা আমার নামকরণ করেছিলেন "অধিকারি।" সেই সরল মহিলা বোধকরি বিদ্রূপ করেননি—আপন স্মৃতির জলতলে বাসাবাঁধা যাত্রারূপের সংগেই বেঁধে নিয়েছিলেন আমাদের শান্তিনিকেতনী রূপটিকে। আজকের দিনের বাঙলার সংস্কৃতিতে অন্ততঃ রয়েগেছে আমাদের এই হৃদয় সংযোগ।

সাহিত্যকা একটি বিশিষ্ট চরিত্র সিংহসদন হলেই বসত আমাদের সাহিত্য-সভা। সেটা পাক্ষিক না মাসিক ঠিক্ মনে করতে পারছিনে। আমরা বড়োরা জড়ো হতাম সাহিত্য-সভায় কলেজ, কলাভবন, সংগীতভবন, বিদ্যাভবন নির্বিশেষে। পড়তাম স্বরচিত লেখা। সভাপতি হ'তেন, অধ্যাপক, শিক্ষক। প্রাক্তন-ছাত্র অথচ সাহিত্যিক এঁরাও হতেন সভাপতি, একবার হয়েছিলেন প্রমথ বিশী, একবার হয়েছিলেন গুরুদেব আমার দেখা কালে।

স্কুল বিভাগের হ'ত আলাদা সাহিত্য-সভা মধ্য-অন্তের। হিন্দী ভবনেরো হ'ত হিন্দী ভাষায়। আমরা সর্বদা একে অপরের সভায় শ্রোতা হয়ে গিয়েছি, শুনেছি মনোযোগে। অনেক অবাঙালী ছাত্রছাত্রীও এসেছেন আমাদের সাহিত্যিকায়।

কী-যে সুন্দর লাগত যখন হোত শিশু বিভাগের। বাচ্চা, বাচ্চা, ছেলেমেয়ে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশের সাহিত্য-বাসর। সেবার ওদের সভা বসল লাইব্রেরী বারান্দায়। মিষ্টি সেজেছে তারা, ধুতির কোঁচা দুলিয়ে পাঞ্জাবি গায়ে। কপালে চন্দনটিপ, গলায় ফুলের মালা, মেয়েরা শাড়ী পরে চন্দনের পত্রলেখা এঁকে যখন উঠে এলো গ্রন্থাগার বারান্দায়, মনে হলো, বারান্দার ফ্রেস্কো, ছবি থেকেই বুঝি বার হয়ে এলো সকলে।

কচি, গলার গান, নাচ, সবচেয়ে বেশী স্বরচিত এক পৃষ্ঠা, আধ পৃষ্ঠার লেখা আমাদের প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতো। একজন পড়েছিল ব্যাঙের ওপর, ব্যাঙের গালফুলোনো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকে সে নিজে যত মজা পেয়েছিলো, তারো চেয়ে বেশী মজা দিয়েছিলো আমাদের। হাসতে হাসতে প্রাণ অস্থ হবার জোগাড়।

আর একজন পড়েছিল গুরুদেব। তাতে সে বলেছিল : গুরুদেব আমাদের মা। সম্প্রতি মাকে ছেড়ে এসেছে সে, মায়ের বিরহ-বেদন দু:খকে, এই বয়সেই শিল্পের সুখে পরিণত করে নিতে চেয়েছিল, বুদ্ধির অগোচরে আরো বেশী কিছুর গভীরে।

জীবনানন্দ বলেছেনঃ সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বহু মানুষের মধ্যেই কবিধর্ম কুঁড়ির আকারে। অনেকটা অনুজ্জ্বল, শাণ পড়েনি তাতে। কিন্তু, creative thinking কিছু কিছু আছে বলেই শ্রোতা, অডিয়েন্স, পাঠক। আছে বলেই, ক্রিটিক, সমালোচক। যদি কবি ছাড়া আর কারুর না থাকত কবিধর্ম তাহলে কবি, শিল্পীকে একেবারেই একাকী হয়ে যেতে হ'ত। জীবনানন্দ নিশ্চিত তাকেই কবি বলেছেন যার কবিধর্ম কলিকায় নয়, ফুটে ওঠা ফুলের মতো সুন্দর। যিনি প্রকাশিত।

আমরা যারা সমবেত হয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, শান্তি-নিকেতন ঘিরে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মীবৃন্দ সকলেই জীবনানন্দীয় অর্থে কবি না হলেও, কবিধর্ম ছিল, কুঁড়ির মতো গন্ধে আকুল। রবীন্দ্রনাথের সমানধর্মী ছিলেন না কেউ-ই—বোধকরি, কেউ ছিলেন না তাঁর দোসর। তবু বড়ো ছোটো ক্ষমতায় বেশী কম কবিচিত্ত, কবিস্বভাব নিয়েই আমরা সমবেত হয়েছিলাম সেই আকাঙ্ক্ষিত দেশটিকে পাবো বলে শান্তিনিকেতনের না হয়েও কবি বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছেন, "সব পেয়েছির দেশ।"

একথা সত্য নয় আমরা সবাই ছিলাম কবি, শিল্পী, মনীষী, কেউ কেউ ছিলেন যদিও জীবনানন্দীয় অর্থেই। এও তো মিথ্যে নয় কাব্যের, শিল্পের, গানের, নাচের, অভিনয়ের এবং পড়াশোনারও একটা বসন্ত বাতাস বয়েই যেত সর্বদা। তার হাওয়ার মধ্যে এসে পড়তাম আমরা। দক্ষিণের হাওয়া মাতিয়ে তুল্‌ত আমাদের। গান-নাচ-পড়াশোনার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শান্তিনিকেতনকে আমরা স্বতন্ত্র করে দেখেছি। আমাদের শান্তিনিকেতন, এ যেন শুধু মুখের

কথা নয়, অনুভব। হয়তো বা এরমধ্যে উচ্ছ্বলতা এসে যেত অগোচরেই। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি থেকে যেন আমরাও রবীন্দ্র চিত্তের একটুখানি ভাগীদার।

আমাদের এই উচ্ছ্বল-আনন্দ স্বভাবতই অনেকের ভালো লাগেনি। কিন্তু, যদি তাঁরা একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতেন, দেখতে পেতেন সৌন্দর্য-প্রিয়তার আনন্দ মাত্র, অহংকৃত আনন্দ নয়, স্পর্ধিত আনন্দ নয়। আমাদের মনের মধ্যেকার বন্দী সব কবিশিল্পী মনোভাবের কুঁড়িগুলিকে ফোটাবার আয়োজনে আনন্দ পাওয়া। যেহেতু জীবনে এই মুক্তি সত্যিই দুষ্প্রাপ্য।

যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার চেয়ে বেশী হয়ে যাবার শিক্ষা-ধারাই দেখেছি শান্তিনিকেতনে, কমের দিকে নয়।

যেমন কোনো একটি ভবনের regular ছাত্র বা ছাত্রী স্বরূপ আমাদের আসতে হ'ত। সেখানে মেনে নিতে হ'ত নিয়মিত পাঠ্যক্রম। তারপরের উদবৃত্ত সময় কেউ যাও কোনো ক্লাশের কোনো কোনো অধ্যয়নে। আমি রেগুলার ছাত্রী সংগীত-ভবনের। বাকি উদবৃত্ত সময়গুলিতে গেছি কলাভবনে, ওদিকে সাহিত্যের ক্লাশগুলিতে। তেমনি কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও আসতেন সংগীত-ভবনে সেতার শিখতে, কলাভবনে সেলাই, আলপনা, বাটিক, চামড়ার কাজে, কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত ভবনের নাচের ক্লাশে।

অর্থাৎ যে যেখানে আছ, সেখানেই থেমে যেয়োনা, অগ্রসর হয়ে যাও। সকালে পাঁচটি অপরাহ্নে তিনটি, আটটি পীরিয়ড বলে মনে হচ্ছে। সংগীত ভবনের নাচের ক্লাশ আমি নিইনি। চারটে ক্লাশ সংগীত ভবনে দিয়ে আর চারটি দিয়েছি সাহিত্য অধ্যয়নে। অনেক সময়ই দিয়েছি লাইব্রেরীতে। সাহিত্য এবং সংগীতকেই জায়গা দিতে ছিলাম আগ্রহী।

একটি নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধন মেনে নেবার পরও, ক্ষমতামাফিক, রুচি মাফিক আরো অন্যদিকে এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা, সে-সময় আর কোন ইন্‌ষ্টিটিউশান্‌ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

মুক্তি আমরা পেয়েছি, একটি বন্ধনও ছিল তাতে। সেই বন্ধনটিকে আমরা ভেতরে ভেতরে স্বীকার করে নিয়েছি। বন্ধনহীন মুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি স্বজীবনে, শান্তিনিকেতনও এই discipline মেনে নিয়েই দক্ষিণে হাওয়ায় উত্তরী ওড়াত। বসন্তের বাতাসে উত্তরী ওড়ানোর উচ্ছলতা সহজেই পড়ত চোখে, গ্রীষ্মের তপ্তদিনের নিয়মিত জলধারার সঞ্চয় রয়ে যেতো লোকচক্ষের অগোচর।

পাশাপাশি দুটি রান্নাবাড়ী জোড়া, আমিষ নিরামিষ। বড়ো-বড়ো দুই হলঘর। হাইবেঞ্চ লো-বেঞ্চ স্কুলের মতো। দুটো করে ব্যাচ বসত দিনেও, রাতেও। টিফিন ছিল বুফে। রান্নাবাড়ীতে আনাগোনা অনেকবার। সকালে বৈতালিকের পর জলযোগ, দুপুরে খাওয়া, বিকেলে ছুটিশেষে জলখাবার, রাত্রে খাওয়া। গরমের দিনে গামলা ভরা চিনির সরবৎ থাকত, লেবুর রস মেশানো। আরো ঠাণ্ডা খাবার ইচ্ছে হলে আমরা কেউ কেউ গেছি দুপুরের রদ্দুরে বৌঠানের আতিথ্য নিতে। ফ্রীজের থেকে কিছু খেয়ে এসেছি। বুধ-বার ছুটির দিনে জলযোগের পালাটা একটু স্বতন্ত্র রান্নাবাড়ীতে, দুটো ভাগ ঃ—একটায় ব্রেড্, বাটার, চা, গরম দুধ, অন্যটায় গরম গরম ফেনাভাত, আলুডিম ভাতে, বড়ো চামচের ফুটন্ত টগ্‌বগানো গাওয়া ঘী। পূর্ববংগীয় ছাত্রছাত্রীর ভিড় জমত সেখানে। কাঁচালংকায় কামড় বসাতে বসাতে কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠ হোত, বালীগঞ্জের ঠিকানা-ধারিণী আমাকে বলতঃ "আলো ঘটি, খাইয়াই দ্যাখ্‌না, কেমন খাইতে।" উত্তরবংগীয়া আমি হেসে জবাব দিতাম—"ঘটি নয়, বাটি। বাঙালী আর কলকাতার সংমিশ্রণ। ও বস্তু অনেক খাওয়া আছে।"

পায়েস আর পাঁপড় ভাজার কম্বিনেশন, রান্নাবাড়ীতেই খেয়েছি, তার আগে খাইনি কোথায়ো। রান্নাবাড়ীর অধিকর্ত্রী সরোজিনী মাসিমার কল্যাণে আমরা পৌষ সংক্রান্তির দিনে পিঠে খেয়েছি। নারকেল নাড়ু আর মুড়ি খেয়েছি মাঝে মাঝেই। এক একদিন দেখেছি, বড়ো বড়ো কাঠের বারকোষে নারকেলকুরুনি বঁঠি পেতে বসে গেছে রান্নাবাড়ীর লোকেরা, ঘষ ঘষ করে ঝরে ঝরে পড়ছে শাদা ধব্‌ধব্ মিহিনারকেল, একটু একটু করে উঁচু হতে হতে চুড়ো হয়ে যাচ্ছে বারকোষে, যেন একটু একটু করে জমছে বরফপুঞ্জ। আমরা

জানতাম আজ বিকেলেই নাড়ু-মুড়ি। আবার হিংয়ের কচুরি কড়াই ডালসূপ, লুচি-তরকারি এও খেয়েছি। মনে হ'তো যেন বাড়িতেই আছি। রান্নাবাড়ীর রসুয়েরাও ছিল বাড়ীর লোকের মতই স্নেহ সতর্ক। সার্ভদিনে দু'ব্যাচের সার্ভ সেরে সার্ভাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, যদি তারা সমস্তটাই পরিবেশন করে ফেলে তাই ওরা আগের থেকে লুকিয়ে সরিয়ে রাখত সার্ভারদের খাবার, গরম করে ধরে দিতো খাবার সময় পাতে। ভারী ভালো লাগত তখন।

সুন্দর একটা স্নেহের সম্পর্ক ছিল সেদিন। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সহপাঠী, ডাক্তারবাবু আমরা, মাসিমা আমরা, এমনকি রান্নাবাড়ীর কাজের লোকেরা আর আমরাও। সকলেরি ভাবখানা ঃ আমাদের শান্তিনিকেতন সব হতে আপন।

রান্নাবাড়ীর কথায় প্রথমেই বলি সরোজিনী মাসিমার কথা : মহিলা তাঁর একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে ছিলেন। সঙ্গে থাকতেন বিধবা পুত্রবধূ রাণুবৌদি আর ছোট্ট নাতি অথবা নাত্‌নী, শিবরাত্রির সল্‌তে যেন। সে সময় আমি নিরামিষাশী, গান্ধীজীর প্রভাবে। আমাকে নিরামিষ ঘরে খেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় বড়ো হয়েছি, বেনারস, লক্ষ্মৌ, দিল্লী, লাহোর? বললাম ঃ কলকাতা। কলকাতা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন ঃ এই বয়সেই কপাল পুড়িয়েছো? আমি হেসে বললাম ঃ কপাল তো হয়নি, পুড়বে কী করে? রেগে উঠ্‌লেন ঃ তবে নিরামিষ ঘরে খাচ্ছ কেন? একী অলক্ষুণে কাণ্ড। যাও, মাছের ঘরে যাও।

তাঁর ক্রোধকণ্ঠে স্নেহ ছিল, আমি রাগ করিনি। হেসেই খেয়ে চলেছি নিরামিষ ঝোল। ঝোলের কথা যখন উঠলই; আমাদের মেনুটা বলা যাক্‌। নিরামিষ রান্নাঘরে ভাতের সঙ্গে থাকত দু-জাতীয় রুটি, মোটি রোটী আর পাত্‌লা হালকা ফুলকা। ডাল, একটা শুকনো সব্‌জী, কিছু ভাজা, একটা রসাদার তরকারি আর দুধ কিংবা দই। রসাদার তরকারিটা আলু-পটল, আলু-ধোঁকা, আলু-ছানার সহযোগে হ'ত, কিন্তু ডালনা অথবা কালিয়া জাতীয়

না হয়ে ঝোলের দিকে চলে যেত। অনেকটা এ্যাংগ্লোবেঙ্গলী, স্যুপ বা ষ্টু আর ডালনা দুয়ের স্বাদ মিলত। একবার এক রসিক ভদ্রলোক, অতিথি হিসাবে দেখতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতন, পরিবেশনকারিণী আমাকে বললেন : আপনাদের শান্তিনিকেতনে এত জলকষ্ট অথচ, রান্নাবাড়ী এলে বোঝবার উপায় নেই।

রান্নাবাড়ীর সব লোকদের নাম মনে নেই। একজনকে মনে আছে, নাম বোধকরি প্রভাকর। ভারী স্নেহশীল ছিল মানুষটি। নিবেদিতা হাসিখুশি মেজাজী মানুষ। গলায় গান লেগেই থাকত। একদিন রান্নাবাড়ীতে প্রভাকরের সামনে অঞ্জলি পেতে আনন্দর ভঙ্গীতে গেয়ে উঠ্‌ল চণ্ডালিকার গান—জল দাও, আমায় জল দাও।

প্রভাকর কোথায় পালাবে ভেবে পায় না। কোনোমতে জলের গেলাস বসিয়ে দে দৌড়। নিবেদিতা বেরিয়ে গেলে আমাকে বলল : ও দিদিমণি কিন্তু এখনো ভালো বাঙ্‌লা বুঝতে শেখেননি।

আমি অবাক্—কেন, সুন্দর বাংলা বল্‌ল তো ?

রক্তিমমুখ নত, প্রভাকর মৃদুকণ্ঠ : ও গান কি আমার কাছে গাইতে আছে ?

চমকে উঠ্‌লাম। পাঠশালা যাবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল কিনা জানিনে। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের সব উৎসবে, নাটক, নৃত্যনাট্যের স্বাদ নিতে নিতে সূক্ষ্মতার শাণে আপনিই শানানো হয়ে গেছে, হয়তো বা অগচোরেই। চণ্ডালিকার থীমের দুইমুখ বক্তব্যের একটি, প্রতি মানুষের মূল্যই মূল্যবান যথার্থ, মানুষের কাছে, এই কথাটাই ছিল নিবেদিতার মনে—আর রান্নাবাড়ীর মানুষটি জেনেছিল, ধন্যতার বোধের পাশাপাশই প্রতিষ্ঠিত নারী-পুরুষের প্রেম।

কতকগুলি বিষয় ছিল ইচ্ছের। তাতে জোর ছিল না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের ছিল সাগ্রহ অনুমোদন। এই জোর না করা জোরটিই শান্তিনিকেতনের চরিত্র স্বরূপ। প্রথম বলি ঃ রান্নাবাড়ীর পরিবেশন। সার্ভ করা compulsary বা বাধ্যতামূলক ছিল না, আমরা মেয়েরা, ছেলেরা ইচ্ছে করেই নাম লেখাতাম পরিবেশনকারীদের নাম তালিকায়। খাবার ঘণ্টা পড়বার কিছু আগেই হাজির রান্নাবাড়ীতে। ছোট ছোট পাঁচ, ছয়, সাত, আট বছরের ছেলেমেয়েরাও থাকৃত দলে। তারা দেবে নুন, কাঁচালঙ্কা, লেবুর টুকরো। রান্নাবাড়ীতে ঢুকেই তদারক বাসনপত্র সব সাফ্ আছে কিনা। কাচা তোয়ালেতে ঝেড়ে নেওয়া। আমাদের ছিল একটি থালা, একটি বাটি, আর গেলাশ। ঘুরে বেড়াতাম যেন অন্য কোন সার্ভার ডাল না শেষ হতেই ঝোল ঢেলে দিয়ে বসেনা বাটিতে, দইয়ের আগে বাটি সাফ্ করে নিতে সময় দেয় যেন। রীতিমতো টিমওয়ার্ক। সবার ওপরে থাকতেন সরোজিনী মাসিমা।

এমনিতে আমি প্রসাধন করিনে। কিন্তু খাবার ঘণ্টা পড়বার আগে মুখ ধুয়ে শাড়ী বদল করে মুখে পাউডার বুলোই, মেয়েরা বলে আজ বুঝি তোমার সার্ভ-ডে। আমরা কয়েকজন পরিবেশনকারিনী হিসাবে নাম পেয়েছিলাম, আমি, শিল্পী সুধীর খাস্তগীরের বোন শান্তিদি, অনিলদার ভগ্নিকন্যা বেলা, রমা। বাহির থেকে যখনি আসত, কোন ইনষ্টিটিউশান, লক্ষ্ণৌ মহিলা কলেজ, বি, টি কলেজ আমাদের উপস্থিতি থাকতে হোত আতিথ্যদানে। সেটাও ইচ্ছেরই ব্যাপার।

ছেলেদের শিশুবিভাগ মাসিমার জিম্মেদারীতে। শ্রীভবনে পাঁচ ছয়, সাত, আট, নয় দশদের তদারকি ভদ্রাদি আর সহ অধিনায়িকা

জয়ন্তীপান্থকে কোন কোন বুধবার আমরা গেছি সহায়তা করতে। উপর থেকে কোনো হুকুম আসেনি, গেছি স্বেচ্ছায়। কেটে দিয়েছি তাদের নখ, চুল দিয়েছি আঁচড়ে, জামায় বসিয়ে দিয়েছি বোতাম। অনুভব করতে চেয়েছি ওরা আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বোন।

শান্তিনিকেতনে কোনো কোনো স্বামী-স্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা। পরিবারে বিশেষ কেউ আর নেই। একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে আর একজনের চোখ অন্ধকার। কিন্তু, শান্তিনিকেতনে নামতে দেওয়া হোতনা সেই অন্ধকারকে। ডাক্তারবাবু, ভদ্রাদি-ছাড়াও এগিয়ে আসতেন অনেকেই। শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরাও। এও সেই ইচ্ছারই আহ্বান—যার ইচ্ছা এসো সেবার কাজে। "এসো আনন্দিত প্রাণ।"

সহজ, সরল কাজ, ইউনিফর্ম আমাদের। আজকের দিনে ইউনিফর্ম বলতে যা বোঝায় তা ছিলনা সেদিন। অনেকেই ছিলেন ধনীকন্যা। ট্রাঙ্ক বোঝাই দামী দামী শাড়ী। দু'একদিন পরতো প্রথম প্রথম, তারপর আপনিই রাখতো তুলে। কেউ বলে দিতনা, আপনিই বুঝতে পারত বড়ো বেমানান হয়ে যাচ্ছে।

আমি গেছি রবীন্দ্রজীবনের শেষতমদিনে। পুরানোদিনের কাহিনী শুনি পুরানোদিনের লোকমুখে। একদিন ব্রহ্মাচর্য আশ্রমে ছিল আরো নিবিড়তা। গুরুপল্লীতে আজ এর কাল ওর আঙিনায় খাওয়া-দাওয়া। বড়ো মেয়েরা তদারক করতেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ-জীবনে সেই বোনের হাতে ভাই ফোঁটা নেবার জন্য দিল্লী কলকাতা, সে যেন রূপকথা।

হঠাৎ যদি বলে বসি, আমাদের ছোট বেলায় ট্রামে ছিল cheep midday, সস্তা টিকিট দুপুরের, রবিবারের ছ'আনার টিকিটে আমরা ঘুরতে পারতাম ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা; আজকের দিনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া: 'আর একটা পা সরিয়ে নিন্‌না আমিও একটা পা রাখি,' উক্তি করা ট্রামবাস যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন: কোনদেশের কথা বলছেন? আমি বলব: কলকাতার। হেসে উঠবে তারা, হেসে হেসেই বলবে, "রূপকথা শোনাচ্ছ বুঝি?

হয়তো আমার কাহিনীও রূপকথার মতই লাগবে আজকের দিনের শান্তিনিকেতন ছাত্র-ছাত্রী সমাজে। সে রাম নেই সেই অযোধ্যাও নেই না থাকলেও সে তো লুপ্ত হয়নি। তাছাড়া রামায়ণ? সে তো রয়ে গেছেই। বাল্মিকী রামায়ণ, রামায়ণ ভবভূতি উত্তররাম-চরিত, তুলসীদাসের রামচরিত মানস, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এমনকি আধুনিক কালের সুরুতে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য, যদিচ বাম-দৃষ্টি, তবু উজ্জ্বল এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্মিকী প্রণাম? হারিয়ে যাবার মতো নয় কেউ।

তেমনি রবীন্দ্রায়ণ থাকে [illegible] হাতের কলমে যা হয়েছে লেখা—যা হবার পথে, ভবিষ্যতেও যা হ'বে। যারা দেখেননি রবীন্দ্র-নাথ, বাল্মিকীর মতো নারদের মুখে শুনি লেখবার সময় নয় আজ, কিন্তু, সমগ্র সাহিত্য মন্থন করে হয়তো লিখবেন ভবিষ্যতের শক্তিধর লেখক। সেই আশা, সবচেয়ে বেশী সেই ইচ্ছেই করব।

শ্যামার মূল্যায়ন ঃ সেদিনে, পরবর্তীকালে

চণ্ডালিকা প্রথমদেখা শ্রীপেক্ষাগৃহে। শান্তিনিকেতনেই প্রথম দেখলাম শ্যামা, তারপর কতবার কত জায়গায়।

শ্যামা জন্মের আদিকালে নাম ছিল না নৃত্যনাট্য শ্যামা। প্রথমে ছিল কথা ও কাহিনীর কথা অংশের কবিতা পরিশোধ। চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, আট-ছয়ে গঠিত, এবং যৌগিক। অর্থাৎ রুদ্ধদল ও মুক্তদল একই সংগে ব্যবহৃত। তরণীযাত্রা ঃ

ঘননিঃশ্বসিত মুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত, সুগন্ধ কেশ—রাশি সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম
কহিল অস্ফুট কণ্ঠে শ্যামা, প্রিয়তম
তোমালাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ
সুকঠিন তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
তোমারে সে কথা বলা।

পরিশোধ যখন কাব্যের কেতাব ছেড়ে নাচের পোষাকে নেমে এল আসরে উত্তীয় তখনো কাব্যের মতই অগোচর। নাট্য অন্তর্গত কোনো চরিত্ররূপে মঞ্চে সে উদিত হয়নি। বজ্রসেনের বারংবার অনুনয়ে শ্যামার উচ্চারণে উচ্চারিত। সে নেপথ্যেই, মঞ্চে তার প্রবেশই ঘটেনি। হয়তো বা কাব্যধর্ম এখানে বজায় ছিল অন্যরূপে। হঠাৎ চমকের মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের কৃতজ্ঞতা, স্বপ্ন ও প্রেম প্রাপ্তির সংগেই ঝড় ও বজ্রাঘাতে, বিবেকসংঘাতে সমস্ত চূর্ণ চূর্ণ হবার সংগে সংগেই দর্শকও হোয়ে উঠত চমকিত চেতন।

তারপর নৃত্যনাট্য শ্যামা এবং প্রায় প্রথমদিকেই কিশোর চরিত্ররূপে অবতারণা উত্তীয়ের। শ্যামার সখিদের বন্ধুরূপে, শ্যামার ব্যর্থ প্রণয়ীরূপে। যার স্বপ্ন নাইবা গেল পাওয়া, আকাশবিহার তো রইল। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলে প্রিয়ার হৃদয়ে বাঁধা রবে চিরদিন। আমরা এই শ্যামাই দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথ মূলত্রয়ীকে অর্থাৎ কিশোর, যুবতী ও যুবককে দেখিয়েছেন রোমান্টিক। উত্তীয়কে এনেছেন সখিদের বেদনার মধ্য দিয়েই, তারাই জানিয়েছে, সে ব্যর্থপ্রেমিক।

নয়নে তোমার উঠিছে জ্বলিয়া, নীরব কী সম্ভাষণা,

বহিয়া বিফল বাসনা। ফিরে যাও, কেন, ফিরে ফিরে যাও

উত্তীয় বড়ো করেনি বারবার এই ফেরাকে। জবাব দিয়েছে কিশোর :

দূর হ'তে আমি তারে সাধিব গোপনে বিরহ ডোরে বাঁধিব

বাঁধন বিহীন সেই যে বাঁধন, অকারণ ॥

* * * *

শ্যামার প্রবেশে সখিরা তাকে জানালো, জীবনের এই পরম-লগ্নকে হেলা কোর না। শ্যামা তার জবাবে বলল :

ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই

যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।

শুধু তাই নয় : সেই সার্থক স্বপ্নের স্বপ্ন দোসর কে না পাবার বেদনায় বিষাদের একটি আচ্ছন্ন কুহেলিকা।

* * * *

আর বজ্রসেন, হার বিক্রী করে দিয়ে নিরাপদ হবার বন্ধু জনোচিত উপদেশ, যেহেতু চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে ; অগ্রাহ্য করে বলল : এই মালা সেই অচেনার গলায় দোলাব যাকে আজো হয়নি চেনা।

* * * *

এই তিন রোমান্টিক কিশোর, যুবতী, যুবক কেউ ছিল না মূলমহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবস্তু-অবদানে। কাহিনী, ঘটনা, নাম

সমস্তই ঋণ নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শুধু treatment অনন্য হয়ে হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের। নামগুলি রেখেছেন, চরিত্রগুলি স্বস্তি দেয়নি রবীন্দ্রনাথকে, তাদের উঠিয়ে নিয়ে এলেন উত্তরণে।

আমার অবাক্ লাগে, সেই জাতক-আখ্যান, প্রায় বোদ্‌লেরীয়, মর্ডান লেখকদেরও চমক লাগাতে পারে, এত লোভনীয়।

তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠপুত্র বজ্রসেন বারাণসী আস্‌ছে। সংগে বণিকদল। পথের মধ্যে দস্যু আক্রমণে লুণ্ঠনে হতাহত বহু বনিক্। বজ্রসেন কোনমতে পালিয়ে এসেছে বারাণসী। রাত্রে জনহীন এক শূন্য গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। সেই রাত্রেই চুরি রাজকোষে। নগর কোটালের চর বজ্রসেনকেই চোর সাব্যস্ত করল। শৃঙ্খলাবদ্ধ বজ্রসেন, রাজ আদেশ ঃ প্রাণদণ্ড।

গ্রীক্ হেটেরি, জাপানী গেইশার মতোই—সেদিনের ভারতবর্ষেও ছিল বেশ কানুন মাফিক গণিকাতন্ত্র।

মার্কেনটাইল যুগের শ্রেষ্ঠীপুত্রদেরও মন বস্‌ত না আপন আপন প্রাত্যহিকী পত্নীতে। গণিকারা সুন্দরী, বিশেষ শিক্ষা নিত মনোরঞ্জনের। নৃত্য, গীত, পারদর্শিনী, উপরন্তু কামশাস্ত্রে সুনিপুণ দীক্ষা। এককথায় হ্লাদিনী অর্থাৎ Charming.

শৃঙ্খলাবদ্ধ বজ্রসেনকে রাজপুরুষেরা বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে গণিকাবীথির মধ্যদিয়ে। অগ্রগণিকা শ্যামা আপন গৃহের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখল বজ্রসেনকে। প্রথমদর্শনেই চিন্তা একে পেতে হবে। রাজপুরুষদের প্রলুব্ধ করল প্রচুর সোনা দিয়ে। এতদিন যে শ্রেষ্ঠীপুত্র উত্তীয় ছিল তার প্রেমিক, তাকেই পাঠাল ছলকরে বজ্রসেনের খাবার দিয়ে শ্মশানে। রাজপুরুষেরা বজ্রসেনকে মুক্তি দিয়ে উত্তীয়কে হত্যা করল। এই pre-planned হত্যায় উত্তীয় রোমান্টিক নয়, নির্বোধ মাত্র। আর বজ্রসেন, শ্যামা উভয়েই নিষ্ঠুর অপরাধে অপরাধী।

অতঃপর উভয়ের বিলাস-লীলা। অবদান বস্তুতে নদী নেই তরণী নেই, আছে উদ্যান দীঘি, প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের বাহিরে থাকত রক্ষীরা। অতৃতীয় অবস্থায় জলবিহার। বজ্রসেন চিত্ত কিন্তু

অশান্তই, ভয় উত্তীয়ের মতো তাকেও যদি হত্যা করে শ্যামা। ভাবনা ক্রমে ভয়ংকর, আশংকা ক্রমে মত্ততার কাছাকাছি। একদিন বজ্রসেন প্রণয়ছলে প্রচুর মদ খাওয়ালো শ্যামাকে, জানিনে, সুরা, আসব, মদ্য কি মদিয়া। নিশ্চিত নয়, হুইস্কি, শ্যাম্‌পেন, রাম্‌ অথবা শেরী। তারপর জলক্রীড়াছলে টেনে জলে গলা টিপে শ্বাসরোধ। আধুনিক লেখকদের চিত্ত লোভানো থীম রয়ে গেছে এখানে—ত্যাগ করা দুঃসাধ্য প্রায়—কেননা, পণ্যরে বাজার সরগরম এই সব মশলা সহযোগে; হত্যার পূর্বে বিবরণ দেওয়া যেতে পারে পুংখানুপুংখ বিস্তৃত রতিক্রীড়া বা সংগমের অতিশয়োক্তি।

তারপর বজ্রসেন পলাতক। ফিরে গেল তক্ষশীলায়। মৃতবৎ শ্যামা কিন্তু মরেনি। বেঁচে উঠ্‌ল শুশ্রূষা ও চিকিৎসায়।

এবার ভয় ভাবনা শ্যামার। যদি বজ্রসেন ছড়িয়ে দেয় উত্তীয়ের মৃত্যু সংবাদ, তাহলে রক্ষা নেই। নিপুণা নটী অভিনয়ের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করল। রাজ অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করল উত্তীয়ের পিতৃগৃহে শোকাতুরা বিধবা পত্রবধূ। আকুল হৃদয়া উত্তীয়ের বিধবা দিনরাত নাম জপছে—বজ্রসেন। তার মিলনস্পৃহা এখনো সমাপ্ত হয়নি। তক্ষশিলা থেকে এলো একদল নট, শ্যামা তাদের মারফৎ খবর পাঠালো। ভীততর বজ্রসেন, দূর দূরতর দেশে গেল পালিয়ে। জীবনে দুজনের আর দেখা হোল না কোনোদিনো।

* * * *

শ্যামা দেখতে বসে আমাদের সমস্ত চিত্ত বিগলিত হোত উত্তীয়ে। আমাদের মতো কিশোরীদের নাড়া দিত না বজ্রসেন। এ্যাভোলেসেন্সের অকারণ পুলকই সেদিনকার আমাদের enistense। শ্যামা যখন বজ্রসেন প্রেমে উন্মত্ত। আহ্বান জানাচ্ছে কোনো বীরের, যে এই অন্যায় দেবে না সংঘটিত হতে—উত্তীয় এলো সেই কিশোর বীর; বলল ঃ ন্যায় অন্যায় জানিনেঃ শুধু তোমাকে জানি।

বুদ্ধির অগোচরে রক্তের মধ্যে এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা আমাদের।

নাই প্রতিদানস্পৃহা। সে যদি আমাকে চেনে, ধন্য ধন্য আমি। যদি নাই জানে, নাইবা জান্‌ল, আমারি জানা মূল্যবান।

শ্যামাকে সেদিন আমরা দেখিনি প্রীতির চোখে। নিষ্করুণা, কঠিনা, নির্দয়া, নিষ্ঠুরা যা পাবার তাকে পেতেই হবে, যে কোন মূল্যে। মাত্র দুটিবার আমাদের ভিতরকার করুণা সরোবরের তটে ঢেউ লাগাত, যখন কারাঘরে ছুটে এসে সে বাধা দিয়ে বলত: সমস্তটাই ছলনা।

দোষী ও যে নয় নয় মিথ্যা মিথ্যা সবই আমারি ছলনা ওযে
বেঁধে নিয়ে যা মোরে রাজার চরণে।

আর একবার মুগ্ধ বজ্রসেনের স্তবের উত্তরে বলা:

আমি দয়াময়ী, মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা। বোলো না।

বুড়িদি সাজতেন শ্যামা। পরবর্তীকালে অনেক শ্যামা দেখেছি, কিন্তু বুড়িদির মতো কেউ নাড়া দিতে পারেনি। তার passion তার তার ক্ষোভ তার ব্যর্থতা এমন করে আর কেউ আমার চোখে প্রকাশ করতে পারেনি। বজ্রসেন সাজতেন কেলু-নায়ার। কথাকলির নৃত্য-শিক্ষক। আর উত্তীয় জাপানী ছাত্র মাকি। ছিপ্‌ছিপে রোগা চেহারায় তাকে বেশ কিশোর কিশোর লাগত। সে যখন কারাঘরে ছুটে এসে বলত: বজ্রসেন দোষী নয়

প্রহরী ওগো প্রহরী, লহো লহো লহো মোরে বাঁধি
বিদেশী নহে সে তব, শাসন পাত্র, আমি একা অপরাধী।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একযোগে দুটি ঢেউ বহে যেত: আনন্দের এবং বেদনার। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যেত। উত্তীয় সেজে এসে নতমুখে বসত আর কেউ। জাপানী মাকি পোষাক বদলিয়ে রক্তাম্বরে সাজত ঘাতক নৃত্য জাপানী স্টাইলে। তারপর উত্তীয়ের বধ।

আমাদের সকলের ক্রন্দনে, বেজে উঠ্‌ত সখীর ক্রন্দনে:

বুক যে ফেটে যায়, হায় হায় রে
তোর তরুণ জীবন দিলি নিষ্কারণে
মৃত্যু পিপাসিনীর পায় রে, ওরে সখা।

মমতা ভেঙে পড়্‌ত শোকের আকুলতার নৃত্যচ্ছন্দে।
আমাদেরো বুক ফেটে যেত, সেই সুরে, সেই নাচে উত্তীয়ের মৃত্যু ; সে যে আমাদেরি মৃত্যু।

*　　*　　*

কেটে গেলে কৈশোরের কাল জেনেছি ট্র্যাজেডী নয় উত্তীয়ের। সে তো পৌঁছেছে তার প্রাপ্তির চরম শিখরে, মরণ ডোরে বিমুখ প্রিয়াকে বেঁধে। বজ্রসেন প্রেম, বিবেক উভয়ের সংঘাতে সংঘর্ষে জর্জর। মৃত্যুতর ট্র্যাজেডী তার।

তরণী যাত্রা, বিদেশী ও বিদেশিনী প্রতি শ্যামার এই থীমটি আমাকে নিরুদ্দেশ যাত্রাই স্মরণ করায়। যাকে জানিনা, যাকে চিনিনা অথচ যে এক পলকেই চমক-লাগিয়েছে সমগ্র-অস্তিত্বে বজ্রসেন শ্যামার প্রেমের কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ আনতে চেয়েছেন সেই সর্বগ্রাসী চমক। বজ্রসেন যেমন তুলনাহীনা, বিদেশিনীকে দেখেছে, শ্যামাও দেখেছে সেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী, পেশওয়ারী বিদেশীকেই। কারাঘরে মুক্তি দিতে এসে সে প্রথম সম্বোধন করল বিদেশী, দ্বিতীয় সম্বোধন প্রিয়, তৃতীয় সম্বোধন চরম ঃ হৃদয়-স্বামী জীবন-মরণ প্রভু।

হে বিদেশী এসো এসো, হে আমার প্রিয়
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো
তোমাসাথে একস্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়-স্বামী, জীবনে-মরণে প্রভু।

তরণী যাত্রা ছিল বোধকরি গঙ্গাবক্ষেই, যেহেতু স্থান বারাণসী। তখনো শ্যামা বিদেশিনী। বজ্রসেন আকুল কণ্ঠ ঃ

আমারে করেছ মুক্ত, কী সম্পদ দিয়ে, অয়ি বিদেশীনী। শ্যামা বলল ঃ সে কথা এখনো নয়। কেটে গেল কিছুকাল। প্রেমের জোয়ারে দুজনেই ভাসাল দু'জনকে। পরকীয় হোল স্বকীয়। বজ্রসেনের সেই চিরন্তন প্রশ্নের অবসান ঘটে না আকুল প্রশ্ন তার ঃ

কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত, কহো বিবরিয়া।

প্রিয়তমের প্রেমলাভে সার্থক নারীর বিশ্বাস বোধকরি হয়েছিল

অন্যতর। দুজনের ভেতরকার দেয়াল গেছে ভেঙে, দুটি পৃথক অস্তিত্ব নয় আর, এক অস্তিত্বে মিলিত। সে যখন বলল : ব্যর্থ প্রেমিক উত্তীয় আমার অনুনয়ে তোমার চুরির অপবাদ নিজের পরে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। গর্জে উঠল বজ্রসেন মুহূর্তেই :

কাঁদিতে হবে রে রে, পাপিষ্ঠা জীবনে পাবি না শান্তি
ভাঙিবে—ভাঙিবে কলুষ নীড় বজ্র-আঘাতে।

মুহূর্তে উঠেছে ঝড়, সমগ্র অস্তিত্ব মন্থন। অথচ রবীন্দ্রনাথ এখানে উচ্চ তীব্র চীৎকারে প্রকাশ করলেন না বজ্রসেনের ক্রোধ বা যন্ত্রণা। প্রেম, বিবেক, যন্ত্রণা, হতাশা সমস্তর সমন্বয় ঘটালেন সুর এবং তালের ধ্রুপদী এক গাম্ভীর্যে। যে কলুষ নীড় ভাঙল, সে তো একা শ্যামার নীড় নয়, বজ্রসেনেরো নীড়।

অথচ এই বজ্রসেনই পেয়েছিল স্বল্পকালের জন্যও পূর্ণ প্রেমের সাক্ষাৎ। বলেছিল :

হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।

হৃদয় আর দেহের মধ্যকার বন্ধ অর্গল : সে চিরকালের মানুষের কাছেই বড়ো বেদনার। শুধু দেহ, সে তো কারাঘর। শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা। আর দেহহীন হৃদয়, সেও আকাশ শুধু, অবাধ সাঁতার, নেই নীড়। তাই পূর্ণ বয়স্ক মানুষ-মানুষী চিরকাল দেহ-মনের মিলনের জন্য ব্যাকুল।

পূর্ণ প্রেমের জন্য বলরাম দাসও কেঁদেছেন :

বাহিরে ভিতর কাঁদে, ভিতরে বাহির
তেঁই বলরামচিত নাহি রহে থির।

রবীন্দ্রনাথ ও নন ঐতিহ্যবিহীন। Tradition এর ধারা বহেই আসেন individual এমনকি জিনিয়াসও। আমি এলিয়ট উক্ত সেই উক্তিকে মানি : No poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poet and artists.

(Tradition and the Individual Talent—T. S. Eliot)

সেই শিল্পী ততখানিই প্রতিভাধর যিনি যতখানি নবীনতর সংযোগ করবেন পুরাতন থীনকেই শুধু না রেখে। রবীন্দ্রনাথ অন্তর-বাহির যুগ্ম সম্মেলনের আনন্দকে চেয়েছিলেন দেখাতে। কিন্তু, আঘাত-পড়ল গুরুতর—কেননা, মূলে ছিল অন্যায়ের অভিযান। বজ্রসেন ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধী না হয়েও শ্যামার প্রণয়ী হয়েই এই হত্যা অপরাধের দায়ে দায়ী। তার enistence হোল দ্বিখণ্ডিত ঃ একদিকে প্রেম, অন্যদিকে বিবেক। মৃত্যুতর ট্র্যাজেডী, তবু পৌরুষেয় শ্রদ্ধেয়।

ক্ষমিতে পরিলাম না, ক্ষমো হে মম দীনতা।

পাপীজন শরণ প্রভু।

সবচেয়ে সমাপন শ্যামার। মৃত্যুতম মৃত্যু। সে জানে, তার প্রেমে সে অপরাধী নয়, অপরাধী বিবেক, ন্যায়-অন্যায় প্রশ্ন। তার একমাত্র বিচারক বিধাতাপুরুষ—কোনো মানুষ নয়।

কিন্তু, প্রেমের পূর্ণতার জন্য প্রিয়তমের ক্ষমাও ছিল একান্ত প্রয়োজন। সে ক্ষমা সে পায়নি। বিধাতা পুরুষের প্রতীক করেই ধরল প্রিয়তমকে ঃ গেলনা, গেলনা কেন কঠিন পরাণ মম, তব নিঠুর করুণ করে। ক্ষম মোরে।

দুজনে চলে গেল দুই পথে—কঠিন বেদনায় দোঁহে, একজনের প্রেম বিবেকের তীক্ষ্নস্বরে বিদ্ধ, রক্তাক্ত, যন্ত্রণায় বিধুর—অন্যজনের দুর্লভ প্রেমের অমৃতপাত্র ভেঙে মৃত্যুতে সমর্পণে নিঃশেষা। বজ্রসেনের তবু আছে বিবেক। শ্যামাই সম্পূর্ণ রিক্ত। দুজনে চলে গেল দুই পথে—জীবনে দুজনের আর দেখা হোলনা কোনোদিনো।

আগেই বলেছি, বুড়িদির মধ্যে বেশ ছিল রাজ্ঞী রাজ্ঞী বা রাজেন্দ্রনন্দিনী ভাব। চণ্ডালিকায় বুড়িদিই সাজতেন প্রকৃতি আর চিত্রাঙ্গদায় সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা। আমার মনে হয়েছে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি এবং রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা জাত হিসেবে দুজনেই একজাতের।

মৃণাল তখনো মৃণালিনী স্বামীনাথন, বিক্রমসারাভাইয়ের সংগে বিবাহান্ত হয়নি মিসেস সারাভাই। চণ্ডালিকায় ও সাজত প্রকৃতির মা। নৃত্যনাট্যে প্রথম প্রবেশ কন্যাকে খুঁজে খুঁজে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, চূড়ো করে বাঁধা চুল, আর সেই চুলের শিখর সাজানো লাল, হলুদ সব নানা রঙের রঙে, তাতে বেশ এসে যেত যাদুকরী যাদুকরী ভাব।

মা দেখলে কন্যা বসে আছে একাকী, যে মেয়েকে মা চিরকাল চেনে তাকে দেখতে পেল না, অচেনা লাগল। মেয়ের মুখের ভাষাও লাগল অপরিচিত। মা রেগে বলে গেল : মিথ্যা দুঃখ গড়ে নিয়ে মিথ্যে কান্না কাঁদ তবে তুই।

চণ্ডালিকায় প্রকৃতির কোনো সখি নেই। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা বা রাজনর্তকী শ্যামার মত সখিদল থাকা তার সম্ভবও নয়। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে দিতে পারতেন দুটি কিংবা একটি অন্তত, না হয় সেও হোত চণ্ডালকন্যাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলাম তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকেও কালিদাস সখি দিয়েছিলেন দু'টি অনসূয়া, প্রিয়ংবদা। যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শকুন্তলার শ্রী গিয়েছিল কমে।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই দেননি কোনো সঙ্গিনী। মানবজগতে অসম্মানিতা বিনা অপরাধে, আমাদের এই জাত মানা জগতে, সে যে কতবড় নিঃসঙ্গতা এইটিই বোঝাবার জন্য প্রথমত, দ্বিতীয়ত, মা ও মেয়েকে এনেছেন একান্ত করে। যাই আর সখি,

বন্ধু, মায়ের কাছেই তার প্রেমের তীব্রতার প্রকাশ, ফলে উভয়ের মিলিত যাত্নবন্ধন ষড়যন্ত্রটি সার্থক হ'তে পেরেছে।

মৃণাল যখন তার ছিপছিপে চেহারা, সাজানো চুলের শিখর নিয়ে ডাকিনী দলকে আহ্বান করতঃ আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়—তার তিনবার আহ্বানে ভয়ঙ্করতার একটা পরিবেষ্টন আসত ঘনিয়ে। যা ঘনায় ম্যাকবেথের তিন ডাকিনী সম্মেলনে। মন প্রস্তুত হতে থাকে অভাবনীয় সঙ্কটের জন্য।

সঙ্কটের পিছন দিককার কথা সকলেরি জানা। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি অস্পৃশ্যা। ফুলওয়ালা তাকে ফুল দেয়না, দইওয়ালা দেয়না দুধ এমন কি চুড়িওয়ালাও দেয়না চুড়ি, পাছে ছোঁয়া হয়ে যায়। অসম্মানিতা প্রকৃতি, অপমানআহতা, মাকে দোষী করেছে এই অভিশপ্ত জন্মদানে। এমন সময় মধ্যাহ্নপ্রহরে এলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ। প্রকৃতির কাছে চাইলেন জল—প্রকৃতি জানাল সে চণ্ডাল কন্যা, ভিক্ষু বললেন ঃ

যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কন্যা।

জলপান করে আশীর্বাদ করে ভিক্ষু গেলেন চলে। প্রকৃতির ভিতরকার ধন্যতার বোধ রূপান্তরিত হোল প্রেমে। দিনরাত্রি স্বপ্ন তার, সন্ন্যাসী আসবেন স্বীকার করবেন তার প্রেম, যেমন স্বীকার করেছেন তার মানবতা। একদিন সন্ন্যাসী সমুখ দিয়ে গেলেন চলে, চিনতে পারলেন না। সুরু হোলো ষড়যন্ত্র। যাত্ন মন্ত্রে বেঁধে আনবার আয়োজন। অপমানিতা নারীর প্রেমের অপমান যেন সইলনা।

সহজ হোলো না, সেই আয়োজন। ডাকিনী যোগিনীর দল এলো, শেষপর্যন্ত কণ্ঠে প্রাণ এনে নাগপাশ বন্ধন মন্ত্র। যে মন্ত্রে ছাড়া পাবার কোনো উপায়ই নেই। সন্ন্যাসীর আসনও টলল শেষ-পর্যন্ত। প্রকৃতি দেখছে তার মায়াদর্পণে তপের শিখর থেকে নাবাচ্ছে টেনে সেই মন্ত্র।

ওরে পাষাণী কী নিষ্ঠুর মন তোর, কী কঠিন প্রাণ, এখনো তো আছিস বেঁচে।

প্রেমের দাক্ষিণ্যর সংগে সংগেই বাজল প্রেমের ক্ষুধার কান্না ক্ষুধার্ত প্রেম তার, নাই ভয়, নাই লজ্জা।

আনন্দ যখন এলেন তার দুয়ারে অবনতমস্তকে উঠল সমগ্র অস্তিত্ব-মন্থন-ক্রন্দন। কোথায় সেই আলো?

মুহূর্তেই অনুভব করলো হাতের মুঠোয় পাওয়া নয় বড়ো পাওয়া, উজ্জ্বল সগৌরব আনন্দ নেই পরাজিত অন্ধ আনন্দে। মুহূর্তে তার ক্ষুধার্ত প্রেম রূপান্তরিত হোলো শান্তম, শিবম্, প্রজ্ঞায়।

করজোড়ে নত হোলো: আমাকেও উদ্ধার করো।

ভিক্ষু আনন্দের সঙ্গে সেও হয়ে গেল ভিক্ষুণী।

* * * *

নৃত্যের নিপুণ দক্ষতা দক্ষিণী রক্তের গভীরে। মৃণালের হাতের আঙুলের মুদ্রায় কথা কওয়া ভঙ্গী। পায়ের এক পদক্ষেপে কন্যা প্রেম অন্য পদক্ষেপে অসাধারণ অন্যায় অপরাধের বেদনা। নাগপাশ বন্ধন মন্ত্রের আগে, যার একটু ত্রুটিতেই মৃত্যু, তার পূর্বেই সে মার্জনা ভিক্ষা করছে: হে পবিত্র মহাপুরুষ। আমার শক্তির চেয়েও বড়ো তোমার শক্তি, তোমাকে অসম্মান করব, তবু প্রণাম।

করজোড়ে মৃণালের সেই মার্জনা ভিক্ষা অপূর্ব। ঘটনার ইঙ্গিত আমরা আবার পেলাম মৃণালের কাছ থেকেই। যে ভয়ঙ্করতাকে ঘটাতে চলেছে ওরা, তার চেয়েও বড়ো শক্তি বৈরাগ্যের। অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের। তার জন্যই অপেক্ষা।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে নৃত্য অপেক্ষা নাট্য অংশই জোরালো। এত কম সময়ের মধ্যে এমন বৃহৎ পরিবর্তন এবং ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে অন্য নৃত্যনাট্যে আর নেই। প্রকৃতির প্রথম উন্মোচনে আমরা তাকে দেখেছি বালিকা—অসাধারণ বালিকা—চিত্রাঙ্গদার নহি সামান্যা নারীর মতই নহি সামান্যা বালিকা, প্রাত্যহিক অসম্মান যাকে বিঁধছে ক্ষণে ক্ষণে, ভিক্ষুর জলগ্রহণ স্বীকৃতিতে যে হয়ে গেল স্বপ্ন দেখা কিশোরী, ভিক্ষুর অস্বীকৃতিতে যে হয়ে গেল যুবতী, পরিশোধ

গ্রহণের তৎপরতায় তার নিষ্ঠুরতা যাদুকরী মাকেও গেল ছাড়িয়ে—শেষপর্যন্ত প্রজ্ঞাপারমিতা।

বুড়িদি ধাপে ধাপে এই অসামান্য নাট্য অংশটিকে ফুটিয়ে তুলতেন। প্রাণবন্ত মেয়েটির ক্ষুধার্ত প্রেম, কামনা-ইচ্ছা, এবং শেষ পর্যন্ত জেনে যাওয়া—তার সামনে থরো থরো ভূমিকম্পে অপেক্ষমান তার জীবনের কোন্ পরিণতি।

ভাঙল দ্বার, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল এজন্মের মিথ্যা। ওগো আমার সর্বনাশ, ওগো আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ আমার অপমানের চূড়ায়, মোর অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রাখো তব চরণ জ্যোতির্ময়।

নৃত্য আংগিকের কথা বলতে পারব না। কিন্তু, মনে হয়েছে passion কে personalityর আগুনে পুড়িয়ে বৈরাগ্যে রূপান্তরিত করা বুড়িদির মতো আর কেউ পারতেন না প্রকাশ করতে।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য, শ্যামার মতো ট্র্যাজিডি নয়, মিলনান্তক নয় চিত্রাঙ্গদার মতো। সাল্লাইমের শিখর চূড়ায় দাঁড়িয়ে তুষারাচ্ছাদিত হিমালয় শৃংগ যেন। অথচ এই গল্পটিই নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থে আছে অন্য চেহারায়। বুদ্ধ যখন জানলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ যাদুকরীর মন্ত্রজালে বদ্ধ হয়েছে, তখন তিনি তার মন্ত্রজাল কাটিয়ে তাকে রক্ষা করলেন পতন থেকে। মানবীয় প্রেমের এই অপমান কবির সহ্য হয়নি, তিনি প্রকৃতির প্রেমের মর্যাদাও রাখলেন আর শিখরে রাখলেন বৈরাগ্যের মর্যাদা।

ত্রয়ীর তিনটি নৃত্যনাট্যই নারী নামাংকিত। শ্যামা নাট্যে গ্রীক্ ট্র্যাজিডির মত সর্বাংশে ট্র্যাজিডি দেখা দিলেও, শ্যামার ট্র্যাজিডিই চরমতম। সমাপন শ্যামারই, কিছু নেই তার। সেদিক থেকে সার্থক নামকরণ হলেও চরিত্রের দিক থেকে বজ্রসেন শ্রেষ্ঠ। নায়িকা অপেক্ষা নায়ক। চণ্ডালিকাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ধাপে ধাপে দ্রুতপরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এনে শেষপর্যন্ত সেই নারীরূপে দেখালেন, যে নারী পুরুষকে টেনে না নাবিয়ে পুরুষের ব্রতসহায়িকা হয়। ক্যারেকটারের তেজে জ্বলে চরিত্রের শিখরে উঠে এনাম সার্থক হলেও আনন্দ প্রকৃতি অপেক্ষা মহত্তর। এক্ষেত্রেও নায়িকা অপেক্ষা নায়ক। একমাত্র চিত্রাঙ্গদায় আমার মনে হয়েছে নায়ক অপেক্ষা নায়িকা শ্রেষ্ঠতর। পাঠ্য কাব্যনাট্য হিসেবেও চিত্রাঙ্গদা অনেক আগেই আমার মন কেড়েছিল। নারীর সেই পুরুষের পাশাপাশি সম অধিকারের কথা ব্যক্ত হয়েছিল বলেই হয়তো আরো বেশী। যার আকাঙ্খা আমরা লালন করেছি গভীরে। নাট্য কাব্যটি লেখা হয়েছিল ১৮৯১ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ উনিশশতকে। নৃত্যনাট্যরূপে দেখা দিল ১৯৩৬ সালে অর্থাৎ ৪৫ বছর বাদে।

চিত্রাঙ্গদায় অর্জুনের প্রথম উন্মোচনই অহংকৃত। তার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটতেই বলল ঃ আহা কী দুঃসহ স্পর্ধা। কিন্তু চোখমেলে পুরুষ বেশী সখিদল সহ চিত্রাঙ্গদাকে বালক ভেবে হেসে উঠ্‌ল বীর যোগ্য ঃ

হা হা হা হা (২) বালকের দল, মার কোলে যাও চলে, তার পরেকার চেহারাও দেখা দিল অসংস্কৃতই। সুন্দর নিরলংকার যে নারীর প্রেম তাকে মর্যাদা দিল না। জানাল ব্রহ্মচারী সে। অথচ মদনের বরপ্রাপ্তা সুন্দরী লীলাময়ীকে সেই নারীকে দেখেই প্রাকৃত

প্রেমে মুগ্ধ হোলো। কোনো চিন্তা নেই। দ্বিধা নেই—তুমি এসো তুমি স্বপ্ন হোয়োনা, সত্য হও।

এদিকে চিত্রাঙ্গদা বীর অর্জুনের নাম শোনামাত্র চমকিত হোলো। যদিও পুরুষ বেশী, পুরুষের মতোই শক্তির অধিকারি। ভিতরকার নারী উঠল জেগে।

অর্জুন। তুমি অর্জুন
ফিরে এসো, ফিরে এসো
ক্ষমা দিয়ে কোরনা অসম্মান।
যুদ্ধে করো আহ্বান
বীর হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব—
অর্জুন? তুমি অর্জুন॥

শেষের লাইনটিতে চিত্রাঙ্গদার বেদনা প্রকাশিত হয়ে তার নারীত্ব দেখা দিত, এমনি তার সুরসংযোগ। সে সময় আমরা অনেকেই পূর্ববংগীয় ভাষায় বলেছি ঃ এইরে মরছে চিত্রাঙ্গদা : শোনস্না গলার স্বর ক্যামন হৈয়া গেল।

সেবা তখন উঠতি নাচিয়ে। বেশ মিষ্টি চেহারা, ললিতভংগী। চিত্রাঙ্গদায় সেজেছিল মদনের বরপ্রাপ্তা সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা। কেন জানিনে, তার নাচ আমার মনে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। যেমন ফেলেছিলেন বুড়িদি। মৃণাল, এমনকি পার্শ্বনায়িকা মমতাও। তাই বলে ওকে আমি কম করেও দেখতে চাইনে। নারীর ললিত লোভম ভংগী ছিল বেশ। আমার লাগত maturityর অভাব। বয়েসও ছিল খুবই কম। অথচ চিত্রাঙ্গদার থীম। ম্যাচিওর্ড থীম। আমার ক্ষোভ রয়ে গেছে আমি সেই চিত্রাঙ্গদা দেখিনি যেখানে বুড়িদি সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা, যমুনাদি একাধারে মিশ্রিত পুরুষ ও নারী। বেবিদি মদন আর বোধকরি অর্জুন শান্তিদা। আমার মনে হয়েছে ছলনার সংগে আপোষ করা চিত্রাঙ্গদার মর্মান্তিক বেদনা বুড়িদিই পারতেন প্রকাশ করতে।

কোন্ ছলনা এযে নিয়েছে আকার

এর কাছে মানিবে কি হার। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

ধীরে রূপক্লান্ত হচ্ছে অর্জুন প্রাকৃত-প্রেম যেন বোঝার মত ভার হয়ে উঠেছে। এমন সময় মনিপুর রাজ্যে এলো দস্যুদল। রাজ্যের সব মানুষ ভয়কাতর। অর্জুন প্রশ্ন করলেন তোমাদের কোনো রক্ষক নেই? তারা জবাব দিল বোধকরি তিনি তীর্থে গেছেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা।

অর্জুন বিস্মিত, কণ্ঠে উচ্চারিত হোলো: নারী, তিনি নারী। বীরহৃদয় ভেবে চলেছে না জানি কেমন সে। স্নেহে যে নারী বীর্যে যে পুরুষ। ছিন্ন হয়েছে অর্জুনের অসংস্কৃত চিত্তের বহিরাচ্ছাদন। সেই নারীই যথার্থ নারী, যে একধারে মিলিত নারী ও পুরুষ। চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে বেজে উঠল আত্ম-অসম্মান পীড়ার অবসান বলল: ভাগ্যবতী সে যে, এতদিনে এলো তার আহ্বান।

আনন্দে সে মদনের কাছে ফিরে গেল সময়ের অনেক আগেই। লহো, লহো ফিরে লহো

তোমার এই বর হে অনঙ্গদেব।

উৎসুকী যাঁরা তাঁদের বলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশন রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থখণ্ডের ৫৩২ পৃষ্ঠা দেখতে। যে ছবিতে মঞ্চের একধারে কেদারায় উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ, পাশে গানের দল, বাজনার বাজিয়েরা, মঞ্চে মদনরূপী বেবিদিকে (নিবেদিতাবসু, নন্দলাল বসুর পুত্রবধূ) চিত্রাঙ্গদা অর্থাৎ বুড়িদি, নন্দিতা কৃপালানি নন্দিত চিত্তেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সৌন্দর্যের বর, চেয়ে নিচ্ছেন তাঁর সত্যরূপ, একাধারে মিশ্রিত পুরুষ ও নারী, অর্জুন বেশে শান্তিদা অর্ধউপবেশনে নতমস্তকে, সখিরা এদিকে ওদিকে ছড়ানো। সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার অবসানেই অপেক্ষমাণ সত্যকার চিত্রাঙ্গদা। যতদূর জানি যমুনাদি হয়েছিলেন সেই চিত্রাঙ্গদা। আর মদন দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন:

তবে তাই হোক্

রূপের অতীত রূপ দেখে যেন প্রেমিকের চোখ।

শ্যামায় আমরা গ্রীক ট্রাজেডির সেই ক্যাথারসিস্ পেয়েছি, ট্র্যাজেডির অশ্রুধারে সিক্ত যা আমাদের স্নাত, পবিত্র করেছে, চণ্ডালিকায় পেয়েছি সাব্লাইমের অধিরোহণ প্রকৃতির সংগে সংগে আমরাও উঠেছি উচ্চচূড়ে দেখতে চেয়েছি মহত্তের শুভ্র আলোক। চিত্রাঙ্গদায় আমরা পেলাম বিশশতকের আধুনিক পুরুষ আর আধুনিক নারীর যথার্থ পরিচয়।

অর্জুন কণ্ঠে বেজে উঠল পুরুষের উক্তি ঃ

দারুণ সে, সুন্দর গো

উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে

নহে সে ভোগীর লোচন লোভা, ক্ষত্রিয় বাহুর ভীষণ শোভা।

চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে বাজল ঃ

পূজা করি রাখিবে ঊর্ধে, সে নহি নহি

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে, সে নহি নহি

যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে

সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হ'তে

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

অর্জুনের গলায় ধন্যতার সার্থকতা। ধন্য ধন্য ধন্য আমি।
ত্রয়ী সম্মিলিত ধন্য শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ খাদের গম্ভীরতার
সুরে উচ্চারণ করিয়ে গভীর করে দিয়েছেন।

ডাইনে, কলাভবন, সংগীত ভবন, বাঁয়ে, রান্নাবাড়ী, সমুখে দক্ষিণ দিকে খোলা খেলার মাঠ, তার পিছনেই গুরুপল্লীর বাড়ীগুলি আমাদের শ্রীভবনের এই ভৌগোলিক পরিচয়।

সাংস্কৃতিক পরিচয় ; সেদিন শ্রীভবন আমাদের সমস্ত শ্রীস্বরূপাদের মিলিত ক্ষেত্র ; সংগীত, কলা, কলেজ, পাঠভবন। সবই সুরু হচ্ছে শ্রীসদন, পাঠভবনের জন্য। তখনো পৃথক পৃথক ভবন ওঠেনি আজকের দিনের মতো। আমাদের মধ্যে অর্ধেক বাঙালিনী, অর্ধেক বাঙলার বাহিরের অধিবাসিনী ঃ কয়েক মাস যেতে না যেতেই সুন্দর আয়ত্বে আনত বাঙলা, রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া ছাড়াও সাহিত্য-সভা,

এবং বাঙালি বাঙালিনী বন্ধু-বান্ধবীও হোত। সেদিন যাঁরা দেখতেন শ্রীভবনকে ; অনুভব করতে পারতেন সমগ্র ভারতবর্ষ।

পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বংগ শোভন রুচির সৌজন্যবান রবীন্দ্রনাথ বংগকে এখানে রেখেছেন সবশেষে, যাঁর কণ্ঠে বেজেছিল "সোনার বাঙ্‌লা।" নিশ্চিত মিলের জন্য রাখেননি।

রাজেশ তখনো রাজেশ্বরী বাসুদেব, হয়নি দত্ত। উচ্চারণে অল্পসংস্কৃতধর্মীতা—বাঙলায় আমরা প্রথম স্বরবর্ণ "অ" টিকে সংস্কৃত থেকে নিইনি, নিয়েছি দ্রবিড় স্থান, সেই গোলমাল একটু থাকলেও কে বলবে পঞ্জাবকন্যা ? আমার ভালো লাগত ওর গলায় রাগধর্মী গানগুলি ; স্বরবিতানে যে গানগুলির উপর রাগ ও তালোল্লেখ। পরবর্তী জীবনে রাজেশ রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিজাবাবুর ছাত্রী, কিছু তান সংযোগ করেছে গুরুদেবের গানে, ফলে বিতর্কের বিষয়ীভূতও ছিল কিছুদিন। কাগজপত্রে এই সংযোজনের স্বপক্ষে, বিপক্ষে বেশ কিছু লেখা বার হয়েছিল।

আমার অবশ্য ভালো লেগেছে ; এ মোহ আবরণের তানগুলি। তানে সে কথাগুলিই ব্যবহার করেছে, স্বরধ্বনির প্রয়োগ করেনি। যদিও অনেকের মতেই অমার্জনীয় অপরাধ। আমার ভালো লাগবার মূল কারণ ; ইমন রাগকে প্রকাশ করতে গিয়ে গুরুদেবের গানকে সে খর্ব করেনি, প্রথম খাদের তানে অনুনয় এবং চড়ায় তার সপ্তক ছুঁয়ে নেবে আসার মধ্য দিয়ে মোহ আবরণ বহন করে যাবার বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে।

আমি অনেকবার ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত অর্থাৎ মার্গ সংগীত আধার স্বরূপ রাখলেও, গাইবার নির্দেশ দিলেন য়ুরোপীয়। সংগীত রচয়িতাই সেখানে সমস্ত, গায়কের স্বাধীনতা ভারতীয় মত অনুযায়ী খর্ব। কেন করলেন এই কাজ, একথা মনে করতে গিয়ে আমার দুটি কথাই মনে হয়েছে :

প্রথমত, তাঁর বাণীরূপের অনন্যতায় পাছে আঘাত লাগে, দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর সংগীতকে আনতে চেয়েছিলেন মার্গসংগীত ও

লোকসংগীতের মাঝখানে। তাঁর সমস্ত রচনাতে যেমন চিন্তাকে বহুদূরগামী করেও ভাষাকে রেখেছিলেন বহুজন বোধ্য, তার মধ্যে অনেকগুলি ধাপ থাকত, যেন প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত জনমানস উঠে যেতে পারে, বয়স, অনুভব, শক্তি অনুযায়ী, তেমনি তাঁর গানও যেন বহুজনের কণ্ঠে বেজে উঠতে পারে সরু, মোটা, উদার, মৃদু, খাদ, অনেক রকম গলায়, নিশ্চিত কিছু tutored হবার প্রয়োজন থাকবে, তবে কলাবন্তদের মত যাঁরা সমস্ত সময় দিয়ে উঠতে পারেন না ; তাঁরাও পারবেন গাইতে। সমস্ত জীবন যেমন তিনি শিল্পকার্য চিন্তা আর সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে এক করতে চেয়েছেন, এও তাই।

Tradition-এর অন্ধ বিশ্বাস না থাক প্রীতি ছিল, বিশ্বাসও ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানতেন ভারতীয় মার্গসংগীত রাগরূপের একটি বন্ধন স্বীকার করে নিয়েও নূতন সংযোজনে নূতন এবং স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এমনকি, আমাদের সেই পদাবলী কীর্তন যাকে আমরা হারিয়েই ফেলেছি আজ, অথচ যে একদিন মার্গসংগীত আর লোক-সংগীতের সেতুবন্ধন করে বিরাজমান ছিল জনমানসে ; সেখানেও এই ভারতীয় ধারাটি বজায় ছিল। কীর্তনীয়ারা প্রায়ই হতেন রচনা-শক্তির অধিকারী, সুরের এবং কথারো। ধরা যাক্ বলরামদাসের সেই গানটি :

এরে হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির
তেঁই বলরাম চিত নাহি রহে থির।
যখন অন্তরে আছিল এই রূপ, নয়ন ছিল পিয়াসী
এখন বাহিরে এসেছে এই রূপ, অন্তর-উদাসী। এরে কে
কৈল বাহির ॥
বাহিরে ভিতর কাঁদে ভিতরে বাহির
তেঁই বলরামচিত নাহি রহে থির ॥

এই পর্যন্ত পদাবলী রচয়িতা। কীর্তনীয়া যোগ করলেন তাঁর আখর :

থির রহে না

ভিতরে বাহির কাঁদে, থির রহে না

বাহিরে ভিতর কাঁদে, থির রহে না

ভিতর-বাহির বিনা, থির রহে না, থির রহে না, থির রহে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্পবয়সে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে নিশ্চিত শুনেছেন এই পদাবলী কীর্তন। শিবু কীর্তনীয়ার টপ্পাংগ কীর্তন তাঁর প্রিয় ছিল। সেই টপ্পাংগ বেঁধেছেন তাঁর কীর্তন ঢংয়ের গানে :

রোদনভরা বসন্ত, সখি কখনো আসেনি বুঝি আগে।

পরক্ষণে অপার—আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সংগীতে কেন করলেন না এই জাতীয় পরীক্ষা একথা ভাববার কথা। একেবারেই করেননি, এও ঠিক নয়। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। ওহে জীবন বল্লভ, সাধন দুর্লভ, এসো এসো ফিরে এসো, বঁধুহে ফিরে এসো এই গানগুলিতে আখর সংযোজন করেছেন, কিন্তু স্বকীয়। অপরের সংযোজন অধিকার দেননি।

আমার মনে হয়েছে তিনি একাজও করেছেন দু'টি কারণেই। রাগরূপে, সুরে বৈচিত্র্য আনতে গেলে যিনি আনবেন তাকে একযোগে দু'টি অধ্যয়ন করে যেতে হবে—এক মার্গসংগীতের বিশিষ্ট অধ্যয়ন, দুই রবীন্দ্র-ভাষা-চিন্তা অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন। রবীন্দ্রমানসকে অনেকখানি অনুভব করা, তাঁর মানসগঠনের পদ্ধতি ও স্বরূপকে জানা।

অস্বীকার করতে পারা যাবে না যে রবীন্দ্রনাথ জন্মরোমান্টিক। আর রোমান্টিকদের বলবার কথার মধ্যে থেকে যায় আশ্চর্য, নতুনকে দেখার নতুন অনুভব। যেমন করে আমি দেখেছি, তেমন আর দেখেনি কেউ। তেমন আর বলেনি কেউ যদিও আমি এখানে এলিয়ট উক্ত সেই উক্তিকে মানি ক্ল্যাসিসিস্ট আর রোমান্টিসিস্টদের মধ্যে সত্যিকারের সেই তফাৎ নেই, যতখানি আমরা বলে থাকি। সাহিত্যিক বা রচয়িতাদের ততখানি আনন্দ নেই এই সব নামকরণে

যতখানি সমালোচক বা অধ্যাপকদের। এবং একথাও বলে দিতে হবে না, রবীন্দ্রনাথ যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের; ভিতরে ভিতরে সুনিবিড় একটি শৃঙ্খলা ও বন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতেন। বন্ধনহীন মুক্তিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। প্রণাম করেছেন বাল্মিকীকে, কালিদাসকে, শ্রদ্ধা করেছেন মার্গসংগীতকে, কীর্তনকে, বাউলকে।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক এবং ক্ল্যাসিসিস্ট উভয়তই একযোগে। সেহেতু সংগীতরাজ্যেও সম্মেলন ঘটালেন Tradition and Modernity-র।

যদি ভারতীয় মার্গসংগীত, ধ্রুপদ এবং টপ্পা ইত্যাদিতে বিশ্বাস না থাকত তবে রবীন্দ্র-সংগীতের অনেক গানই আমরা পেতাম না। যদি কীর্তনের কাব্যরসসুষমা মিথিলা এবং বাঙলায় অমন প্রাণ মাতানো রূপে দেখা না দিত, তাহলে পেতাম না তাঁর অনেক কীর্তনাংগ গান। ধ্রুপদ, টপ্পা, কীর্তন, বাউল, সব পূর্বসূরীদের সংগে গ্রথিত.করে নিতে হবে রবীন্দ্র সংগীত।

প্রশ্ন উঠবে: তাহলে গাইবার নির্দেশ কেন য়ুরোপীয়? কেন রবীন্দ্রনাথই সর্বেসর্বা; কেন স্বরলিপির শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাঁর গান?

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে Albert Shweitzer এর motion Thought and its Development বইটির Tagore, foundation of Ethical World and Life Affirmation অধ্যায়টি থেকে অল্প একটু অংশ উদ্ধৃত করি, যাতে করে রবীন্দ্র মানসগঠনের কিছু আভাস আমরা পাব। তিনি বলছেন:

"In Tagores magnificent thought-symphony, the harmonies and modulations are Indian. But the themes remind us of those of European thought."

একথা সত্য, যে রেনেসাঁ আন্দোলন বাঙলায় আসে, তা য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতার সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ে। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর যুগ্ম-সংস্কৃতির অবদান। সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিম, মাইকেলও তাই। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে সাহিত্য ক্ষেত্রেই আরো

সূক্ষ্মতরভাবে ভারত ও য়ুরোপের সমন্বয় ঘটালেন তাই নয়, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, এবং তাঁর সঙ্গীতেও। যদি তা না হত তবে আমরা পেতাম না তাঁর প্রথম বয়সের কালমৃগয়া, বাল্মিকী প্রতিভা, শেষ বয়সের emotion উন্মোচক অথচ ভারতীয় অনুভবে অনবদ্য নৃত্যনাট্যগুলি। সবচেয়ে বেশী শেষ বয়সের রোমান্তিক গানগুলি একেবারে স্বকীয়। শেষপর্যন্ত একথা স্বীকার্য রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, উপশাস্ত্রীয়ও নয়, দ্বৈতবাদী। রাগরূপের অদ্বৈত নয়। সুর ও বাণীর পার্বতী-শঙ্কর সহযোগ। আধখানা সুর আধখানা বাণী অথবা বলা যেতে পারে সুরের বাণী এবং বাণীর সুর, যা লিরিক্যাল। এবং আমরা সকলেই জানি লিরিক বেশী ভার বহন করে না। তার মধ্যে উক্ত যতখানি অনুক্ত তার চেয়ে বেশী বই কম নয়। তাঁর প্রথমদিকের গানগুলিতে ধ্রুপদ, টপ্পা, কীর্তনের ভঙ্গী প্রবল থাকায় যদিচ বা শক্তিশালী গায়ক বা গায়িকা যিনি একযোগে রবীন্দ্র মানস-গঠন সম্বন্ধে অনুধাবন অভিজ্ঞ, যা লাখে না মিলয় এক, কিছু বিস্তারের সুযোগ তাঁর পক্ষে থাকলেও শেষের দিককার গানগুলিতে একেবারেই নেই। সে গানগুলি বেশী লিরিক্যাল, রোমান্তিক রঙে রসে জড়ানো। তাতে কিছু জুড়তে গেলে সেটা মেকানিকাল হয়ে যায়।

কাজেই মাঝে মাঝে এ প্রশ্ন এসে পড়া সংগত, তবে কি তাঁরাই আসবেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। যাঁরা সংযোজন করতে পারবেন না, মধুর কণ্ঠের অধিকারি বা অধিকারিণী বা কোনো ভাবগর্ভ অনুভবের উন্মোচক কণ্ঠস্বরের অধিকারিরাই।

খানিকটা নিরুপায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাহক এবং বাহিকারাও। গায়কের স্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করে গেলে হয়তো বাণীরূপের সৌন্দর্য যাবে হারিয়ে আর যা হারিয়ে গেলে আমরা আর পাব না রবীন্দ্রসঙ্গীতকে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো যা হবার সম্ভাবনা আছে খুবই।

* * *

রাজেশের গলায় যেমন রাগধর্মী গানগুলি বেজে উঠত। ইন্দুদির গলায় বেজে উঠত কীর্তনাঙ্গ গানগুলি, বেদনার অতখানি দরদ আর মাধুরী খুব কম গলায় পেয়েছি। সত্যদা কন্যামোহর সেদিনের কণিকা মুখোপাধ্যায় ওর গলায় ছিল বাঁশিতান, ওর সোনা গলানো, রূপো গলানো গলায় প্রাণ পেয়ে বেজে উঠত, গুরুদেবের রোমান্টিক রসের গানগুলি।

আমার মনে হয়েছে নোটেশান সত্ত্বেও (যেহেতু তা staff notation নয়, যার মধ্যদিয়ে বেশী কিছু বার হয়ে যাবার অবকাশ কম, ভারতীয় স্বরলিপি অপেক্ষা ঘনবদ্ধ) শান্তিনিকেতনে শিখেও সব গান সকলের গলায় একরকম হয় না, কিছু স্বতন্ত্র হয়েই যায়। মানায়ও না সকলের গলায় সব গান। শান্তিদা, ইন্দুদি, রাজেশ, মোহর, সুচিত্রা, এক একটি গানে হঠাৎ যেমন আপন দোসর পেয়ে যায়, তেমন সব গানে নয়।

শান্তিদার :	কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
ইন্দুদির	আমি যখন ছিলেম অন্ধ
রাজেশের	এ মোহ আবরণ
মোহরের	বাজে করুণ সুরে
সুচিত্রার	সার্থক জনম আমার

ওই গানগুলি যেন আর কাউকে তেমন মানায় না।

এক একটি পরিবেশেও এক একটি গান পায় স্বরূপ। একবার এমনি বুধবার মন্দিরে মন্ত্রপাঠের পর "সঙ্গীত" উচ্চারিত হবার পরই এস্রাজে ছড়ের টান লাগল। গান উঠল বেজে

আর রেখোনা আঁধারে আমায়, দেখতে দাও
তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।

আমাদের সকলের বুকের মধ্যেকার জমা কান্না—সমুদ্রে ঢেউ লাগল ওই গানের জোয়ারে। চোখের কোণে জল, ঠোঁটে স্বল্প হাসি, গাইছে কালুখাঁ। ও দেখতে পেত না, দুটি চোখই অন্ধ, ও

শুধু শুনত। ও গান আমি আর কারুর গলায় অমন শুনিনি কোনোদিনো। আর শুন্‌বও না কখনো।

আর একটি গান। সেদিন পূর্ণিমা। আষাঢ়ের পূর্ণিমা। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। খোলা জায়গায় মোহর গান ধরেছে ঃ

ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

মোহরও বোধকরি সেদিন ছিল পঞ্চদশীই। কী ভালোই না লেগেছিল সেই মেঘ, সেই পূর্ণিমা চাঁদের আলো আর মোহরের গলা।

মনে আছে কলাভবন সভাগৃহের সেই গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়।

সুশীলা রাওএর বড় বোন বেড়াতে এসেছেন শান্তিনিকেতন। সুশীলার কাছে আমরা অনেক শুনেছি, খুব ভালো গান, কিন্তু গাইবেন না, রেডিয়ো, রেকর্ডিং, সভা কোথায়ো নয়। শুধু আছেন ওর গোপাল, সেই ঠাকুরঘরে ঢুকে তানপুরা তুলে নেবেন হাতে।

শুনে কেউবা হাসত গোপনে মুখ আড়াল করে, কেউ সামলাতে পারত না সামনেই হেসে ফেলত।

আমরা সবাই তাঁকে ধরলাম ঃ শোনাবেন না আপনার গান। একটু চুপ করে থেকে বললেন ঃ

ওয়ার্ধায় প্রণাম জানিয়েছি গান্ধীজীকে, শান্তিনিকেতনে জানাব গুরুদেবকে। গাইব।

আমরা কেউ কেউ ভাবলাম, বড়ো অহংকার, প্রায় স্পর্ধার কাছাকাছি।

কলাভবনের বড়ো ঘরে বসল আসর। যে ঘরে গুণী শিল্পীদের ওরিজিনাল ছবির প্রদর্শন হত মাঝে মাঝেই। একবার এখানেই দেখেছিলাম অবনঠাকুরের আঁকা বাউল, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে বাউল, একতারা হাতে, মুদিত চোখের মুখখানি আলোয় ভরা। যেন তমসো মা জ্যোতির্গময় অথবা ফাল্গুনীর অন্ধ বাউল। বাহিরে অন্ধ, ভিতর আলোয় ভরা। আমি তন্ময়, সব ছবি ছেড়ে ওই ছবিই দেখছি কতক্ষণ : ললিতা কাঁধে হাত রাখল ঃ

—কীরে গুরুদেবের ছবি দেখছিস।

চমকে উঠ্‌লাম, সত্যিই তো এ বাউল যে রবীন্দ্র বাউল।

* * *

সেইঘরেই আলাপ সুরু। একে একে সব ক্লাশ ছুটি হয়ে যাচ্ছে। সংগীত, কলা, কলেজ। তিন সাড়ে তিনঘন্টা গাইলেন, সমস্ত সময় খানিই দু'চোখ মুদিত, দেহভংগী স্থির। সচলতার চূড়ান্ত ব্যক্ততা, কণ্ঠের অপূর্ব স্বরলহরী। তিন সপ্তকজুড়ে অনায়াস- চলাফেরা। কলাভবনের ছেলেমেয়েরা বসে গেছে স্কেচে, সেদিন তাদের খাতায় জমা হয়ে গেল ধ্যানমগ্না গায়িকাটির মূর্তি তাঁর অগোচরেই। শ্রোতারাও ধ্যানমগ্নপ্রায়ঁ ভৈরবীর সুরে সুরে ভরে বিস্মিত পুলকে কল্পিত সেই প্রাক্-দ্বিপ্রহর।

* * *

সোমা যোশী, ছোটখাট ফর্সা চেহারা, পাঠে অগাধ অনুরাগ। আলো নিভে গেলে শ্রীভবনে হ্যারিকেন জ্বেলে আমরা দু'মাথা এক হয়েছি অনেক রাত। আমি লিখছি, কবিতা বা গল্প। সোমা পড়ছে কলাশিল্প ইতিহাস। গ্রীক ভাস্কর্য, ইতালীয় শিল্পকলা, রাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকায়েল এঞ্জেলো, ভারতবর্ষের অজন্তা ফ্রেস্কোর সংগে মিলিয়ে প্রাচীন চীনের ফ্রেস্কো কাহিনী। সোমাও শেষপর্যন্ত হয়ে গেল রাজেশের মত বাঙালিনী, সোমা ব্যানার্জী।

কমলা কাপুর, সোমার উল্‌টো চেহারা, দীর্ঘ। অবশ্য গৌরাংগীই, পঞ্জাবকন্যা। পাঠে অনুরাগ সোমার মতই। মাঝে মাঝে কথা হ'ত। স্বল্পবাক্। কিন্তু, যখন কিছু বলত, সুন্দর বলত।

মৃনাল অর্থাৎ মৃনালিনীর কথা আগেই বলেছি। নাচের দক্ষতা ছিল ওর দক্ষিনী রক্তেই, তবু আমাকে মুগ্ধ করল পূর্বদেশ ভ্রমনান্তে ওর নৃত্য। গম্ভীর মহিমায় মিশ্রিত হিল্লোল। খাবার ঘরে ওর হাত ধরলাম: মৃনাল—সুন্দ—র। জবাবে বলল: then it was really good,

অন্যরা অভিমানক্ষুব্ধ্…বাঃ, আর আমরা যে এতক্ষণ ধরে এত বললাম!

মৃনাল বলল : তোমরা তো সবসময়ই বলো, যখনি নাচি।

Wonderful, lovely, nice.

*　　*　　*

ক্ষীণ, দীর্ঘ মেয়েটি জয়া আপ্পাস্বামী। শ্রীভবনে সেদিন দীর্ঘাংগী ছিলো অনেকেই,—রাজেশ, কমলাকাপুর, প্রীতিপাণ্ডে, মৃনালকেও প্রায় বলা যেত। কিন্তু, আশ্চর্য একটি ক্ষীনতা ছিল জয়ার, ক্ষীণ, দীর্ঘ অথচ নুবু নয়, হেলে পড়েনি কোথায়ো, সোজা মাথা তোলা। আমাব বারবার মনে হয়েছে :—খোলা আকাশ তলে গাছের মাঝখানে দাঁড়ানো সুজাতা মূর্তিটি, পায়েস নিয়ে চলেছে বুদ্ধের উপবাস ভংগেব আহার্য, গাছের মতোই রদ্দূর, জল, আলো-হাওয়ায় স্নাত, বট-অশ্বত্থ, ঝুরিনামা গম্ভীর বৃক্ষ নয়, দীর্ঘ একহারা ইউকালিপটাস্ বা কাশ্মীরের সরল চীড় যার অন্তরের মাধুরীই ভিতবকার সুগন্ধ, সেটি জয়াকে দেখেই রচিত। রামকিংকর বেইজের এই মূর্তি যদি কেউ না দেখে থাকেন, অথচ-ঔৎসুক্য জাগে মনে এবং শান্তিনিকেতন যাওয়া সম্ভব না হয় এখনি, ললিতকলা-আকাদেমী প্রকাশনেব ইংরেজীতে লেখা Contemporary Indian art Series এর Ramkinkar পুস্তিকাটির ২২ নং প্লেট মিলিয়ে নেবেন, আমার বর্ণনার সংগে। ওই ছোট বইটিতে জয়ার লিখিত ছোট্ট একটি রামকিংকর পরিচিতিও দেওয়া আছে, অল্পেব মধ্যে সুন্দর।

*　　*　　*

এবার বলতে পারি আমার বাঙালি বন্ধুনীদের কথা। শ্রীভবনের পূর্বেরদিকে শেষতম ঘরে আমরা চারজন থাকি। নীলা, বেলা, রমা আর আমি। নীলা, বেলা, কলেজের ছাত্রী, রমা কলাভবনের আমি সংগীতে। সকালে সব আগে এসে রদ্দূর পৌঁছত আমাদের ঘরে। জ্বলজ্বলে রদ্দূরে আমরা খুব ঝক্ঝকে রাখতাম আমাদের ঘর। বিছানা

সাফ্‌সুতরো, শাতিনিকেতনের চাদরে ঢাকা। পর্দার অন্তরালবর্তী তাকগুলিও গোছানো। ফলে আমরা শ্রীভবনে সাফসুতরো ঘর রাখাতে অগ্রনী-সর্বদা। ছেলেবন্ধুরা খুব হাসত শুনে। নীলা, বেলা, রমা জীবনের ছোটখাট খুঁটিনাটিতেই গিয়েছিলাম জড়িয়ে। আমি যেন ওদের তিন বোনেরই আর এক বোন। শান্তিনিকেতনে মশক প্রভাব অতিরিক্ত। মশারি না খাটালে রক্ষা রবে না, সংগে সংগেই ম্যালেরিয়ার রাজ আক্রমণ। আমার ওই কাজটিতে যৎপরোনাস্তি অনিচ্ছা, খাটাইনে। অতএব গোলটেবিল বৈঠক এবং বৈঠকে স্থির ঃ যে যার না খাটিয়ে ভার নেবে এক একদিনেব। আমার পালা যেদিন আস্‌ত, আমার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত সবচেয়ে ছোট বোন রমা—থাক্‌, তোমাকে অত ভাবতে হবে না, আমিই আছি। রমা এখন শান্তিনিকেতনেই, রাণীদির ছোট ভাই সুহাসদে'র স্ত্রী। সে সময় সুহাসও শান্তিনিকেতনে কলাভবনেই ছিলেন। জানি না, নীলা, বেলা আজ কোথায় ?

মনুদি অর্থাৎ মনোরমা কলাভবন কন্যাদের প্রায় অভিভাবিকাস্বরূপ ছিলেন। অনেকদিন পরে কলকাতায় ট্রামে দেখা। চিনি চিনি করে শেষপর্যন্ত চিনলাম ঃ দুজনেই অনেক বদলেগেছি।

শান্তিদি, শিল্পী সুবীর খাস্তগীরের বোন। গ্রাজুয়েট হবার পর এসেছেন শান্তিনিকেতন। শ্রীভবনে আমরা অনেকটা আলাপচারী ভংগীতে তর্কসভা বসাই। গোপাল হালদারের ভংগীতে বললে ঃ স্রেফ্‌ আড্ডা অর্থাৎ আড্ডাবাজি।

আমরা একদল বিবাহ বিরোধী রোল নিয়েছি, শান্তিদি সপক্ষে। বললেন : আমরা আত্মীয় যাঁরা বিয়ে করেননি, সাবধান করছেন ঃ আমাদের মতো ভুল কোরনা, নিঃসংগ হোয়ে যাবে শেষকালে।

আমরা নতুনশব্দ কয়েন (coin) করেছি, চেতাবনী। যত্রতত্র ব্যবহার করি। বললাম ঃ তাঁরা তো চেতাবনী দিচ্ছেন নদীর ওপার আর নদীর এপার ? তোমার মা হয়তো ঠিক্‌ উল্টোটি বলে বসবেন বিয়ের বড়ো জ্বালা, স্বামী সংসার, ছেলেমেয়ে—মস্ত ঝঞ্ঝাট।

—কই আর বলেন? বরং বলেন, এতগুলি ছেলেমেয়ে যার নাম যশ হোলো তার জন্য গর্বিত। যারা তেমন কিছু হোতে পারল না তাদের ভাবনাভাবতে lonelyness কী বস্তু, তার স্বাদই পেলাম না।

*   *   *

কমলাদি নিমগ্ন হয়ে যেত সেতারে, গুরুদেব আদর করে নাম দিয়েছিলেন সেতারিনী। অরুনা সেন, কৃষ্ণকলি বলা চলত—কালোরঙেও সুন্দর মুখ, সুন্দর দেহলতা। অরুনা বেনারশ কি লক্ষৌ থেকে এসেছিল। পুরী থেকে এসেছিল স্মৃতিকনা। সুরেলা রিণ্‌রিণে গলায় গাইত :

ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতলজলের আহ্বান
মন রয়না রয়না রয়না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ।

বোধকরি, সমুদ্রডাক শুনত থেকে থেকেই।

সন্ধ্যা, আরতি, সুকৃতি, সুতপা, তারা, অরুন্ধতী। তারা, অরুন্ধতী দুজনেই দেখতে ভালো, অভিনয়ও করত সুন্দর। বহুপরিচিতা অরুন্ধতী আজ, সিনেমা জগতে চলে গিয়ে। তারা কোনখানে জানা নেই, বাঙলায়, বাঙলার বাহিরে অথবা বাঙ্‌লাদেশ ষ্টেট্‌স্‌, ক্যানাডা বা রাশিয়া কোথায় কে জানে?

সুতপার ইংরেজীতে অনার্স। ওর মধ্যে ছিল আপন ভোলা ভংগী। আপন মাধুরী সম্পর্কে একটু কম সচেতন, মেয়েরা যা থাকেনা প্রায়ই। থাকত এলোমেলো। একরাশ চুল ঘাড়ের কাছে মস্ত খোঁপায় ভেঙে পড়ে থাকত, প্রসাধনের লেশমাত্র নেই। এমনকি কাজলও নেই বড়ো বড়ো চোখে। ওর এই প্রসাধনহীন সৌন্দর্যই আমাকে টানত বেশী। নিজের emotion কেও ঢাকা চাপা দিতে পারতনা সুতপা। একবার আমরা দুজনেই পড়ছি ওদের ঘরেই হঠাৎ ধপ্‌ করে একটা আওয়াজে চমকে চেয়ে দেখি : সুতপা হাতের বইটাকে পড়তে পড়তে মেঝেয় ফেলেছে ছুঁড়ে। বইটাতে

রবীন্দ্রনাথের লেখার তিক্ত সমালোচনা ছিল। আমি অবাক্ ঃ—ও কী করলে ?

—কী বিশ্রী আলোচনা করেছে গুরুদেবের লেখার।

—গুরুদেব বলে দেখছ কেন ? রবীন্দ্রনাথ বলে দেখো। বিরূপ আলোচনা তো হবেই। শক্তির পরিচয় আছে কিনা সেইটে বিচার করো।

—তুমি পড়োনি তাই বলছ। আমি ছুঁড়ে ফেলেছি, তুমি হলে আগুন জ্বালাতে।

হেসে বললাম ঃ দূর পাগ্‌লী। তাহলে লাইব্রেরীতে থাকত নাকি ওই বই। আমিও পড়েছি।

ললিতা কলাভবন ছাত্রী—ইংরেজী সাহিত্য পড়ত অখণ্ড-মনোযোগে। Conception অনার্সের ছাত্রীদের চেয়ে কম ছিলনা। ও আমাকে নরম গলায় ডাক্‌ত—নমি।

ওর স্কেচ এখনো আছে আমার কাছে। ছেলেকোলে মা! চাইনীজ কালির আঁচড়ে আঁকা। নিচে লেখা ঃ নমিতাকে ললিতা।

মিস্ ম্যার্জরী সাইকস

আমার মন হরণ করেছিলেন এক মহিলা, তিনিও শ্রীভবনেরই। শ্রীভবন অধ্যক্ষা বা অধিনায়িকা, ইংরেজী কেতায় বললে ঃ হস্‌টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। আমরা ওঁকে মিস সাইক্সই বলতাম। দিদি বা মাসিমা নয়।

দীর্ঘ, দীপ্ত। পা ফেলতেন হংসভংগী। কাঁধ ছড়ানো চুল, বড়ো বড়ো চোখ, অঞ্জন এঁকে কখনো হননি নীলাঞ্জনা বা পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী। যদিও ছিলেন তন্বী, শ্যামা অর্থাৎ গৌরবর্ণা।

আমাদের ভোর বেলায় ডেকে তুলতেন ঘণ্টা বাজিয়ে। ব্যায়াম না করলে, বিকালের খেলা না খেললে শাস্তি পেতে হ'ত। একবার

আমাকেও শাস্তি পেতে হল। খেলার আঙিনা থেকে পলাতক হয়ে আমরা দু'তিনজন গেছি ভ্রমণে, গান গেয়ে ফিরছি ধরা পড়লাম। শাস্তি দিলেন: সব খেলাতেই যোগ দিতে হবে সাতদিন। ভলিবলের বল ছুঁড়তে গিয়ে প্রাণ কাঁদত ত্রাহিমাং মধুসূদন। সাতদিন পরে নিষ্কৃতি।

সখকরে একবার মেয়েরা কলেজ ভার্সাস্ কলাভবন ফুটবল ম্যাচ খেললেও। আসলে বাস্কেট বল আর ব্যাড্‌মিনটন্ খেলাই ছিল আমাদের।

পুরুষের মতোই শক্তি, ভোর বেলাতেই জেগেছেন, রাত দেড়টা, দুটো, তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাও জ্বলছে আলো। লেখার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লেখায় মগ্ন। পুরুষোচিত নিরাশক্তি, হসটেল অধ্যক্ষা হসটেলের মধ্যে কেউ বুঝতে পারতনা কে তাঁর প্রিয়পাত্রী। স্নেহ এবং অনুশাসনে ঘটতনা তারতম্য।

পুরুষের মতো রমণীটির নারীত্ব অনুভব করেছি সেদিন, সংপুতে গুরুদেব অসুস্থ। মিস্ সাইকেসর মুখ ব্যথায় নীল। কোনো ক্লাশ হচ্ছেনা, আমরা বসে আছি নীরব, নতমুখ। দু'একজন ছাত্রী আলাপনে মুখর হোলো, আসছিলেন মিস্ সাইকস্, দাঁড়িয়ে গেলেন। বেদনার্ত গলায় বললেন: শান্তিনিকেতনের মেয়ে তোমরা; কী অসীম লজ্জা।

নিয়ম শৃঙ্খলা খুব মানলেও রসিকতাকে নিয়ে নিতেন সহজে। একবার কোনো ছাত্র রসিকতা করেছিল সামনেই, ভেবেছিলো, বুঝবেন না বাঙলার সব শব্দ। বলেছিল: মার্জারী। মিস্ সাইক্স্ অল্পলজ্জার হাসি হাসলেন। চলে গেলে বললেন অনিলদা: —করলে কী? ভালো বাংলা জানে মার্জারী। জানোনা, ও অনুবাদ করছে গুরুদেবের ছেলেবেলা My Boyhood days.

শান্তিনিকেতনের সমস্তটাই বৈতালিক, সঙ্গীত, কলা, পাঠ, সাহিত্যসভা, অভিনয়, জলসা, তর্কসভা, বিশিষ্ট গুণীমানীর ভাষণ ইত্যাদিতে জমজমাট। শুধু মঙ্গলের রাত ওটা যা খুশির। পরদিন ছুটি। খুশির রূপটা মাঝে মাঝে একটু অন্যরূপও নিয়ে নিত। খুব বেশী সন্দেশ বা পোলাও কালিয়া খেলে যেমন মাঝেমাঝে তেলেভাজা বা ফুচ্‌কার স্বাদ নিতে ইচ্ছে করে, তেমনি আর কি ?

ওদিনে আমরা অনেক মজাদার লোকসঙ্গীত, উর্দু, হিন্দী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী, বাংলা আর তামিল, তেলেগু ভাষাতে গেয়েছি আর শুনেছি। ঢোলেও চাঁটি পড়েছে বেশ। যারা নাচের ক্লাশে যায়না তাদের নাচ। গলায় যাদের সুর নেই তাদের গান। সেতারে যারা কেবলি পীড়িং সুরু করেছে তাদের বাজনা। মঙ্গলের রাতটাকে বেসুরো, বেতালা বাজিয়ে আমরা তৈরী হতাম পরবর্তী সুরেলা দিনগুলির জন্য।

আমাদের শান্তিনিকেতন গানটির প্যারডি করেছিলাম আমি আ—আ—আ—আমাদের হতশ্রীভবন।

হঠাৎ কী যে ঢুক্‌ল মাথায় mock শ্যামায় মেতে উঠলাম। যার যেটি অতি ঠেক্‌ত, সেগুলিকেই বেছে নিলাম। দীর্ঘ ভরপুর চেহারার বেলা, বজ্রসেন (কেলুনায়ার), পাতলা ছিপ্‌ছিপে, ফর্সা সুতপা উত্তীয় (জাপানী মাকি) আমি শ্যামা (বুড়িদি)। একদিন নেচে চলেছি দুজনে :

প্রেমের জোয়ারে ভাসবে দোঁহারে, বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও মনে হল সামনে গানের দল ঈষৎ নতমুখ, চাপছে হাসি।

ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাবনা, বলে যেই পিছন ফিরেছি আমি বেলা দুজনেই আধুনিক সিনেমা, নাটক আঙ্গিকের ফ্রীজ। দীর্ঘাঙ্গী মিস সাইকস, মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাসি সামলাচ্ছেন

আমাদের পিঠে দিলেন চাপড়েঃ চমৎকার। প্র্যাক্‌টিশ করে যাও এই শ্যামার অভিনয় হবে।

অহর্নিশি প্রার্থনা আমার যেন করতে না হয় এই শ্যামা। এতো শুধু মঙ্গলের মজার রাতের জন্যই তৈরী।

Mock শ্যামা হোলনা, বড়ো কঠিন মূল্য দিতে হল এর জন্য। হোলো এগুরুজের মৃত্যু।

শ্রীভবন বাইরে বন্ধুভবানী, পোষাকী নাম সুমিত্রা, সেতার বাজাতে ভালোবাস্‌ত। এখন প্রচণ্ড গৃহিনী, দিদিমা এবং ঠাকুমাও। মোহর, হাস্নু, অনু, মমতা, সুদর্শনা, গীতাঞ্জলি, নীলিমাদি; ছেলে বুদ্ধ বড়ুয়াকে নিয়ে থাকতেন ওই বয়সেও প্রচণ্ড শখ গান শিখতেন আমাদের সঙ্গে; বাচ্চা, আজ যে নীলিমা সেন, তখনি মিষ্টি গাইত। ওর দিদি, বোধকরি নাম অনিমা, ক্ষিতিদাদুর পুত্রবধূ, কঙ্করদার স্ত্রী হয়েছিল পরে।

মনে পড়ে নীলমাধবের দরাজ গলায় কীর্তনের রস উঠ্‌ত' ঘনিয়ে অথবা প্রভাতী গম্ভীর ফুরগুলি কিংবা মিশ্রমল্লালে

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।

পাবনার ছেলে আবদুল আহাদ, উত্তরবঙ্গজ পরত ধুতি-পাঞ্জাবি, মন্দিরে গাইত গান মিঠে গলায়ঃ

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহেগো কভু

শুনেছি বাংলাভাগের পর একসময় হয়েছিল ঢাকা বেড়িয়ো স্টেশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত নির্দেশক।

রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরি, ভালোই কবিতা লিখত। ছাত্রদের মধ্যে ওই ছিল অদ্বিতীয় চাদর ওড়ানো, ছাত্রীদের মধ্যে আমি এলাম উড়িয়ে চাদর।

আজকের দিনে ফিল্মজগতের অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, তাকে আমরা ঢুলু বলেই জানতাম। বনফুল-সহোদর। প্রথম ছবির ডাইরেকশান—দাদার বই—কিছুক্ষণ। সহপাঠিনী অরুন্ধতী নায়িকা। বেশ পরিচ্ছন্ন হয়েছিল ছবিটি। ওর আর ছবি দেখিনি।

জ্যোতিষ দেববর্মণ সুন্দর গাইত, চেহারা চমৎকার, পড়াশোনাতেও ভালোই ছিল। কোনো কোনো কন্যা উন্মনা হলেও জ্যোতিষ এ বিষয়ে নির্বিকার। ওর গলায় একটা গান ভারী ভালো লেগেছিল :

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা।
আজি এ নিবিড় তিমির যামিনী বিদ্যুৎসচকিতা ॥

বন্ধু ভবানীর তিন মামাই শান্তিনিকেতনে। প্রভাস সেন কলাভবনে, সতুসেন, দিলীপ সেন কলেজে। শঙ্খদা, নরনারায়ণ চৌধুরী কলাভবনের খুব পরিচিত ছাত্র ছিলেন।

জানি সেই মৃণালিনী, কমলাকাপুর যে এখন মিসেস চৌধুরী এবং আমেদাবাদ আর্টিরার এব্‌ল্ মহিলা এক্সিকিউটিভ, গোরাপন্থ হিন্দী সাহিত্যর লেখিকা শিবানী, প্রাণোচ্ছ্বলা কমলা মল্লিক, মারাঠিনী ভারতী পূর্ণিয়া, সুধী ওয়াগলে, গুজরাতের নিবেদিতা পরমানন্দ, সুশীলা আষাঢ় ইউ, পির সুষমা মাঙ্গলিক, প্রীতিপাণ্ডে, সোমা যোশী দক্ষিণের তেজস্বিনী চিট্টি, জয়া আপ্পাস্বামী, নীলা, বেলা, রমা, শান্তিদি মনুদি কমলাদি, প্রমীলাদি, সুতপা, সুকৃতি, ললিতা, মোহর, নীলমাধব, আহ্লাদ, রথীন্দ্র অরবিন্দ, বন্ধু ভবানী, জীবন স্রোতের আবর্তনে সব ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ভিন্নস্থানে। জানিনা, তাদের দর্পনে ধরা পড়ে কিনা শান্তিনিকেতন মায়া, উতলা করে কিনা চিত্ত। হয়তো বা করে।

পঁচিশ বছর আগে আমেদাবাদ নগর নিগমের লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মোহনভাই প্যাটেল, যিনি অন্ততঃ শ পাঁচেক গুজরাটীকে লিখিয়েছেন বাঙ্‌লা এবং বেশ কিছু পরিমাণে বাংলা বইয়ের সঞ্চয় রেখেছেন ঐ লাইব্রেরীতে, তাঁর কন্যা নন্দিনী প্যাটেল নামকরা পর্বত আরোহিণী, অনেক খুঁজে এলেন সাবরমতী। আমাকে কখনো দেখেননি। আমি শান্তিনিকেতনে যাবার বেশ কয়েক বছর আগেই ছেড়েছেন শান্তিনিকেতন : বললেন : দিদি, বাপের বাড়ীর কাকের ডাকও মিষ্টি। আর বোন্ তুমি কাছে এসো যাবে হারিয়ে। খবর পেয়েই আমি এসেছি।

কী জানি, হয়তো বা
আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায়না কভু দূরে

মোদের মনের মধ্যে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে। হয়তো বা পুরো সেই সুরও নেই, অর্ধাভাস, কিছুবা ইশারা কেননা, কোন দিনই ফেরানো যায় না।

তাছাড়া অনেকেই বহির্মুখী এক দরজা দিয়ে পিছনে ফেলে রেখে দুঃখসুখের রঙে রঙীন পৃথিবী, গিয়েছেন বেরিয়ে।

গুরুদেব, গান্ধীজী, রথীদা, বৌঠান, বিবিদি, বুড়িদি ক্ষিতিদাদু ফণীদাদু, মাষ্টারমশাই, মল্লিকজী, সত্যদা, মাসিমা, সেই বালক শুভময়, দরাজ গলায় যে গাইত ঃ

আমার প্রিয়ার ছায়া

না জানি আরো কতজন। এই সেদিন অনিলদা আর রাজেশ।

আমিও চলেছি এগিয়ে সেই বহির্মুখী দরজার দিকেই। শান্তিনিকেতনও নিশ্চিত নেই সেদিনের শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্র পরবর্তী শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন যত, নিয়েছেনও তত। তিনপুরুষের তারুণ্য এখান থেকেই তুলে নিয়েছেন শিরার রক্তে, তুলে নিয়েই নবনব পত্রোদ্গম, কিশলয়, ওরা কথা কয়েছে নতুনের। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ নেই, এ যেন দুর্ভর ভাবনা। আমার এমনি হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। কয়েকদিনের জন্য গেছি।

"শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি।"

যে চৌকিটি এসেছিল আর্জেন্টিনার সান্ইসিদ্রোর মিরালরিত্তর সেই বাড়ীটির থেকে, ডানদিকে ঘন গাছ, সমুখে বয়ে যাওয়া তরতরে নদী। সমস্তটাই বিজয়ার ভালোবাসায় ভরা। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি আর জীদ্ (আঁদ্রেজীদ্) কৃত ফরাসী অনুবাদ পাঠ মুগ্ধ মহিলা প্রথম রবীন্দ্রদর্শনকে অনুভব করেন, জীবনের

পরমাশ্চর্য দিন। আর্জেন্টিনার সেই কবি-লেখিকা-মহিলা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, রবীন্দ্রদত্ত নাম বিজয়া। জাহাজের দরজা কেটে কেবিনে ঢুকে, অনেক সমুদ্র, অনেক ঘাট পেরিয়ে চৌকিটি একদিন এসে পৌঁছল নীল সাগরের তীর থেকে লালের প্রান্তর উত্তরায়ণে। ইদানীং প্রায়ই বসতেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো স্মরিত হোতো বিজয়ার প্রীতি, প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ যাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন পূরবীর কবিতাগুলি। শূন্য সেটি।

উদিবী, উদয়ণ, উত্তরায়ণ, মন্দির, লাইব্রেরী, কলাভবন, সংগীতভবন, সমস্ত শান্তিনিকেতন, যেদিকেই চাই সজল চোখের জলে। বুকের গভীরে শুনলাম কৌতুককণ্ঠ:

"অকৃতজ্ঞ, চলে গেছি সেই বড়ো হোলো?"

১৯১৭ সালে গিয়েছি একবার, অল্প সময়ের জন্যে। দেখলাম ভবন উঠেছে অনেক। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে ফাঁক নেই। আমাদের সময় অনেকখানি পথ পার হয়েই আমরা গেছি। মন বললঃ বেড়াও উঠেছে কিছু। একটি মেয়েকে কলাভবনের একটি মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল: বলব কী করে আমি কলেজে পড়ি। আমাদের সময় আমরা প্রায় সকলেই সকলকে চিন্‌তাম। এও ভাবলাম: আমাদের সময়কার সংহতি সম্ভবও নয়। বিস্তার পেয়েছে এখন।

তারপর আর হয়নি যাওয়া।

শান্তিনিকেতন সমাপনকালে কিছু সত্যউক্তি করব। সমস্তই সুরে বাঁধা ছিল প্রতিদিন, একথা সত্য নয়। কখনো কখনো ঢিলে হয়ে গেছে সেতারের তার, বেজেছে বেসুরো:

কলেজ	কলাভবন	সংগীত
বাংলা	ইংরেজী	হিন্দী

বিশ্বভারতীকে ছাপিয়ে, শান্তিনিকেতন বিস্মরণে বেজে উঠতে নিড ভাঙাগলার স্বর। কালো গগল্‌স্ চোখে রবীন্দ্রনাথের অরন্তুদ রোদন শুনেছি বৈ-কি!

যেহেতু চিন্তা চিরকাল সুসংহত: creative thought একটি প্রদীপে জ্বলে যেহেতু এবং যেহেতু কর্ম team work এর সম্পাদন: সেহেতু শিখারা একে একে জ্বলে মূল প্রদীপাধার থেকে উজ্জ্বল, নিষ্প্রভ, নিভু নিভু কেউ, কেউবা নিভে ছড়ায় ধোঁওয়া। যেহেতু আমরা অনেকেই বিরোধে বেশী অভ্যস্ত, মিলন-অপেক্ষা।

আরো একটি সত্য উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ প্রয়োজন। বেসুরো বাজত খুব কমই—আমাদের মঙ্গলের রাতের মতই, তারপর আবার সুর সমন্বয়। গুরুদেব ব্যথা পেয়েছেন বা পাবেন একথা বোধগম্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেঁধে নিয়েছি সেতারের তার, এস্রাজের কান মুচড়ে, হাতুড়ি পিটে তবলায় একেবারে প্রস্তুত। গান ধরেছি উৎফুল্ল:

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সেযে যায়না কভু দূরে
মোদের মনের মধ্যে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।

শান্তিনিকেতনের সকাল-সন্ধ্যা উপাসনা, মন্দির ভাষণ, ছাতিম-তলার ছায়া, হাঁটা পথের রাঙাধূলো, আমের মঞ্জরী, ঝরা লালফুলের গন্ধ, সংগীতভবন গান তান, কলাভবন রঙের ছটা, শিক্ষাভবনের শিক্ষা গ্রন্থাগারে গ্রন্থ। সাহিত্যিকার আসর, সিংহসদনে, লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে, আম্রকুঞ্জে নৃত্যনাট্য, অভিনয়, গানের আসর; সবচেয়ে বেশী উদিচীর সেই মানসী-রচনার সময়কে, রবীন্দ্রনাথকে বারবার ফিরে ফিরে পাওয়া : প্রাণে লেগেছিল ভালো। মনে হয়েছিল : অবিচ্ছিন্ন সুরে হোল বাঁধা, যখনি যেখানে যাব, গাঁথা হয়ে রবে।

অথচ কোনোদিনই ফেরানো যায়না; এমনকি কালকের দিনটিকেও নয়। তবে জাগাতে চাও কেন সেই সময়, যে সময় ইতিহাস আজ। স্মৃতিচারনার সেই কিশোরী মেয়েটি নেই, নেই মর্মর বুকের কাঁপন, হাসলে আকাশ আলো, গাইলে ঝর্ঝর-ঝর্ণা, লিখলে সহজ বিশ্বাস, হাতে হাত রাখলে প্রীতি।

রবীন্দ্র তিরোধানের পরও অনেক তিরোধান : গান্ধীজীকেও যেতে হল। যুদ্ধ-অস্ত্র, হিরোশিমা, মন্বন্তর ডানাভাঙ্গা এদেশ-ওদেশ। স্রোতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে অস্ত-কৈশোর, ঝড় : পঞ্চাশের সালে নয় শুধু মনে, চিত্তে, চিন্তায়। আমরা এলাম সরে রবীন্দ্র পথ থেকে বহুদূর।

যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ : দিয়েছো তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি
যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছো তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।

এতো শুধু সুরে গাই, 'পরিচয় পাইনি তো কারু, কে সে সুখ-দুঃখ দাতা? প্রণমেচ্ছা কই সকলের প্রতি? বরং বিতৃষ্ণা, তিক্ততা অথবা। আমাদের কাল নিষ্ঠুর, কঠিন, ক্রুর, অন্ধরাগে গাঁ গাঁ, প্রীতি উন্নাসিক উল্লাস-প্রগাঢ় তিক্ততায়। বিলাসী, নিষ্ঠুর স্বার্থ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কাল আমাদের, তার জালে জড়ালাম আমরা। প্রবেশ করেছি অভিমন্যু ব্যূহে নির্গমন অজানা। আমি, আমার প্রিয়, আমার বন্ধুরা, এমনকি আমার শান্তিনিকেতনের অনেক ভাই, আমার শান্তিনিকেতনের বোন। আর আমাদের সমবেত হৃদয় ব্যর্থতার, যন্ত্রণায় পাকদণ্ডী পথ বেয়ে বেয়ে অনেক কান্না কাঁদল। বিমর্ষতার চর্চা করল অগাধ।

* * *

গদার ভিভ্রে সাঁভী, যেভাবে জীবন কাটাও ছবিটির পর্দায় পতিতা মেয়েটির মুখে বলিয়েছেন: চোখের পাতা ফেল্‌লে রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌—হাত ওঠালে—রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌। সে বলেছিল তার বান্ধবীকে, সব কিছুর জন্যে তুমিই রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌।

সার্ত্র বোদালয়ার সমালোচনায় দায়ী করেছেন বদল্যারকেই। "বদল্যার নিজেই রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌ নিজের জীবন-যাপনে। যে জীবন তাঁর পাওয়া উচিত ছিলনা। প্রবল ক্ষণমুহূর্তের মোহ, নিষ্ঠুরা প্রেমিকা, তীব্র নারী ঘৃণা অথচ গণিকা আসক্তি, সিফিলিস রোগ—নিজেই নিয়েছিলেন বেছে।" যদিচ, অনেকেই এই সমালোচনাকে ভেবেছেন ঔদ্ধত্য, সার্ত্র নন কবি বা কাব্য-আলোচক, তবু সার্ত্র আলোচনা কাব্য অন্তরালবর্তী দর্শন এবং স্বজীবন প্রতি তুলনাও। পরিস্থিতি এক। আশ্চর্য রকম মিল দুজনের। দুজনেই শিশুকালে হারিয়েছেন নিজের বাবাকে, মা করেছেন পুনঃ বিবাহ দুজনেরি। মায়ের দ্বিতীয়বার বিবাহেই বদল্যার নিজেকে ভেঙে ফেললেন টুক্‌রো টুকরো অথবা—কে জানে— স্বইচ্ছায় নিলেন সুযোগ।

অনেক হয়েছে বলা, আলো, প্রেম, ভালোবাসা, স্বাস্থ্যকর পূর্ণতার বাণী। আমি অন্ধকারে দিই ডুব, আর দিয়ে, উচ্চ উচ্চারণে

নিজেকে নতুন করে জানি, জানাই, গড়ি : অমঙ্গল, ঘৃণা, পাপ, কৃষ্ণা ভেনাসের মূর্তি—বতিচেল্লীর নগ্নতাকে নিই, বাদ দিই তার সকরুণ মুখের সৌন্দর্য :

"এসো পাপ, এসো সুন্দরী।"

ফ্ল্যর ছ্য মলের ভূমিকায় ক্লেদজ কুসুমে স্বয়ং উক্তি রেখেছেন : লব্ধ প্রতিষ্ঠ পূর্বসূরীরা সুন্দরকে নিয়েছেন ভান করে, আমাকে হতে হবে অন্য কিছু।

অবাক লাগে এই মানুষটির দ্বৈততায় :
this refined man went with the lowest harlots. আর উচ্চারিত হয় সেই অমোঘ ঘৃনার উচ্চারণ।

Woman, that vile slave, proud and stupid. প্রকৃতি দেয়নি তাঁকে শান্তি, তাঁর কাছে গোধূলি ঘরে ফেরাবার ডাক নয়, নয় প্রেমিকার বাহু, যার স্নেহহাসি। যদিও প্লেজ্যাণ্ট :

Here is the pleasant evening, the criminals friend, it comes stealthily like an accomplice with a wolf's tread, the sky closes slowly like a huge alcove and impatient man changed into a beast."

অথচ এও ছিলনা একান্ত। স্ববিরোধিতা মূলে। জীবনানন্দ ও জীবন ভীতি ও বিদ্বেষ দুই বিভিন্ন কক্ষ থেকে বার হয়ে চলেছে সমান্তরাল রেখায় পাশাপাশি, অবশ্য আনন্দ রেখাকে ফেলে রেখে দূরে টেনেছেন ঘৃণাও বিদ্বেষের রেখা দীর্ঘতর দূর পথযাত্রী টেনেছেন নিজেই। এবং নিজের গরজেই।

শুধু সার্তর নন, এলিয়ট অভিযোগও : a symbol of morbidity.

সময় বুঝেই সুরু হোলো মবির্ডিটির সাধনা, আলোক-অভিসারী রবীন্দ্র দেশেই তিমির-অভিসার। কারু কারুর মতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছিলেন পুরোভাগে। কাব্যে তিমির-অভিসারের পুরোভাগে না থাকলেও চিত্রকলায়, আশ্চর্য অদ্ভুত সব চেহারায়, গাঢ় ঘনরঙে এবং

শেষদশকে কাব্যেও বজায় থাকেনি অখণ্ড প্রত্যয়—নাড়া খেয়ে খেয়ে উঠেছে। মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত বেদনাগুলি সকলেরই শুভবুদ্ধিকে দিয়েছে নাড়া, যে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রকাব্যে পেয়েছিলেন জীবনের সমন্বয় সন্ধান, সেই ইয়েট্সের কণ্ঠেও বেজে উঠল হতাশা : things fall apart, centre cannot hold.

অস্বীকার করব না, পুরনো পৃথিবী যাকে রূপ কথায় দেখেছি, বর্তমান পৃথিবী যাকে দেখেছি চোখের আলোয়, ভাবী পৃথিবী যাকে দেখেছি স্বপ্নে, দেখব সুন্দরতর—ভেঙে পড়তে লাগল চোখের উপরেই। তবু বোধকরি, আমাদের গরজ ছিল অন্যত্র এবং গরজ বড় বালাই।

* * *

সজনীবাবু বলেছিলেন কিশোরীটিকে : কেন যাচ্ছ শান্তি-নিকেতন? ওই বটবৃক্ষের ছায়ায় গুল্ম হয়ে যাবে।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করেছিল : ওই মহা বটবৃক্ষ ছায়া শুধু কি শান্তিনিকেতনেই?—না, সাহিত্য, ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, ভংগীতে। আর গান গেয়ে গেয়ে ভদ্রলোক গোটা দেশটাকে জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত ছেয়ে দিচ্ছেন। কারুর জন্যে জায়গা থাকছে না। সেইজন্যেই আপ্রাণ চেষ্টা আমাদের রবিচ্ছায়া থেকে বার হয়ে আসবার। তুমি মুগ্ধ ভক্ত, যাচ্ছ পদতলে একেবারে হারিয়ে যাবে। ওঁর বাইরের চেহারা, ভেতরকার আলাপ নিজেকে বাঁচানো মুস্কিল। বিরোধী মন নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়েও লোক ভক্ত হয়ে ফিরে আসছে।

সময় সত্যই ছিল তাই, সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপ্ত। বোধকরি তাই চলেছিল প্রাণপণ চেষ্টা : আলোক অভিসারের পরিবর্তে তিমির অভিসার। Poetic health poetic morbidity.

জাতকের গল্পে আছে : সোনালী পাহাড় সব পাখীকেই লাগে একরকম দেখতে, মিষ্টি, সোনালী। তাই তারা একদিন উড়ে গেল। উড়ে গেল স্বতন্ত্র হবে বলে। রবীন্দ্রনাথ সেই পাহাড় যার সামীপ্য-ত্যাগ করে দূরে দূরে সরে আসতে হল সব কবি লেখকদের।

সকলেই ঠিক্ করলেন স্বতন্ত্র হবেন : নিজেদের দেখবেন এবং দেখাবেন আপন আপন রচনার দর্পণে।

কিছু পরিমাণে নিরুপায় ছিলেন সেই সময়কার কবি সাহিত্যি-করা, বিশেষ করে কবি। যদিও জানি, সৃষ্টিতে সমস্তই অদ্বিতীয়—সৃষ্টিতে নেই নক্‌শো করা, একটি পাতা, একটি ফুল, একটি পাখি নয় আর একটির মতো। কিন্তু, এই যে অল্প একটুখানিতে একটু একটু নতুন, তাকে দেখতেই পায়না মানুষ—তার চোখে লাগে এক। শিল্পী, সাহিত্যিকদের তাই শিখর চূড়ায় চড়বার চেষ্টা, স্বাতন্ত্র্যে দর্শনীয় না হওয়া পর্যন্ত স্বীকৃতি অসম্ভব।

খ্রীষ্টভক্তকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন : এতদিন পরেও কেন এত মুল্য ক্রাইস্টের ? ভক্ত দিলেন জীবন বিবরণ : তাঁর করুণা, প্রেম, সাফরিং তিলতিল মৃত্যু ক্রুশবিদ্ধতায়। প্রশ্নকারী বললেন : এতমূল্য পেলে আমিও সব করতে পারি খ্রীস্ট যা করেছেন। ভক্ত বললেন, যদি সবও করো তুমি, তবু পাবে না সেই মূল্য। প্রশ্নকারী অবাক—Why ?—Because Christ did it first. প্রথম হবার এবং প্রথম করবার প্রশ্নটি শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে খুব বেশী আছে। তাই যাঁরা প্রথম হতে চাইলেন, ভাবলেন রবিঠাকুর যেহেতু সব আলোর কথা, সুন্দরের কথা, এমনকি অসুন্দরের সুন্দরের সাধনার কথাও বলে ফেলেছেন; আমাকে বেছে নিতে হবে অন্য কিছু। না হলে আমি হয়ে যাব দ্বিতীয়।

অন্ধকারের কথা জীবনানন্দর মত করে কেউ বলেননি। ভাষায় ভংগীতে ভাবে কোথায়ো রাখেননি রবীন্দ্র আলোকের ছায়াপাত। বাংলা কাব্য জীবনানন্দেই এক বাঁক নিয়ে মোড় ফিরল রবীন্দ্র ধারা থেকে সরে। জীবনক্লান্ত মানুষের কথা, সমুদ্র সফেন লবণাক্ত ঢেউ—বাঙলাসাহিত্যে এমন করে আর বলেননি কেউ।

রোমাণ্টিক শৈলীকে বহিরংগে স্বীকার না করে, ভাষায়, ভংগীতে একটা এলোমেলো এলানো ছড়ানো অনাস্বাদিত স্বাদ আনলেও

অন্তরংগে জীবনানন্দও রোমান্টিক। রোমান্টিকদের মতই উচ্চারণ করলেন :

আমার পায়ের শব্দ শোনো
আর সব হারানো পুরানো।

আসলে কবিধর্ম এমনি বস্তু, যার মধ্যে রোমান্টিসিজম রয়েই যায় বীজের আকারে। তার ফলশ্রুতি যাই হোক্। এবং কবিরা ঔপনিষদিক ঈশ্বরের মতো এক বললেন : বহু হবো। বহু হবার Creatine ইচ্ছা অন্তরে লালন করলেও এবং সৃষ্টি কালে তার কিছু স্বাদ নেবার ইচ্ছা করলেও ঠিক বাইবেলীয় ঈশ্বরের মতো বলতে পারেন না :

Let there be light and there was light অথবা darkness. আমি একথা মানি, কোনো শিল্পীই নন স্বয়ম্ভু।

জীবনানন্দকেও এই পায়ের ধ্বনি শোনাবার আশায় যেতে হয়েছিল আর এক পায়ের ধ্বনির কাছে। শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে গুরু আছেনই—ধর্মশিক্ষার গুরু তিনি না হতে পারেন—ক্রমিক বদল হতে পারে গুরুদলের। গুরুর দীক্ষার সঙ্গে আপন শিক্ষা ও ক্ষমতা মিলিয়ে আমরা দর্পণ রচনা করি নিজেদের, যে দর্পণে পড়বে আমার মুখের ছায়া—আমার ঠোঁটের, চোখের, বুকের ভাষা। কেউ কেউ গড়া দর্পণ ভেঙে আবার নতুন দর্পণ তৈরীতে তৎপর হন, সময়, অনুভব, চিন্তায় মিলিয়ে।

ফ্রান্সের মানুষটির :কাছে নাড়া বেঁধে নিলেও ভারতীয় গায়ন পদ্ধতির স্বাধীনতাকে মূল্য দিয়েছিলেন। বাঙলার এই মানুষটি ফরাসী মানুষটির মতো প্রকৃতিকে দেখেননি। দেখেননি খুনী-সহচরী সন্ধ্যা, যেন নখর-লুকানো গুঁড়ি মেরে চলা বাঘিনী। বাঘিনী রক্তপিপাসিনী অথচ মনোহরা। যদিও তাঁর রাত্রির পেঁচারা মাঝে মাঝেই চোখ উল্‌টিয়ে বলেছে : "ধরা যাক, দু'একটা ইঁদুর এবার।" যদিও লম্বা গলা বাড়ানো উট জানালার ধারে এসে ডাক দিয়ে যায়

নিঃশব্দে, যদিও কোনো এক বোধ রক্তের ভিতরে খেলা করে মানুষকে নিয়ে গেছে মর্গের শয্যায়।

তবু ঠানসিড়ি নদী ছিল। ছিল হাঁটুডোবা উলুখড়, খয়েরি ডানার চিল; বনলতা সেন, পাখীর নীড়ের মতো চোখ, যদিও সে চোখে বাসা নয় চিরকাল, চিরশান্তি দেয়নি সে। এযুগে দু'দণ্ডই ঢের কবির দু'দণ্ডে শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

বদল্যারের সঙ্গে ইয়েট্স্‌কে মিশ্রিত করেছিলেন জীবনানন্দ। শেষের দিকে তিমির "অভিসারও করতে চেয়েছিলেন অতিক্রমণ। বোধকরি রক্তের ভিতরেই এসেছিল ক্লান্তি তিমির-শয়নের অতলান্তে। বোধকরি রক্তের ভিতরেই খেলা করে উঠেছিল আর এক আলোকের বোধ। কিছু আরো বেশী বেঁচে থাকলে হয়তো বা আমরা আর একটু বাঁক পেতে পারতাম জীবনানন্দের হাত থেকে।

* * *

বিষ্ণু দে এলিয়ট আর মার্কসবাদের দুই উজ্জ্বল বিপরীত মেরুতে গাঁটছড়া বাঁধলেন অসীম-সাহস-বীর্যে।

লরেন্স, গর্কী, জোলা টলষ্টয়, টমাসমান, হুইটম্যান, অডেন, স্পেন্‌সার, পিরানদেল্লো, ব্রেখ্‌ট্, পাউণ্ড, পাবলোনেরুদা, শতসমুদ্র, শতআকাশের ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্নান, বাতাসে বাতাসে নিঃশ্বাস।

* * *

এর মধ্যেই স্বাধীনতা, প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটর, সি, পি, আই, সি, পি, আই এম, নক্‌শাল, যুবকংগ্রেস। সন ১৯১১-এ আমাদের গর্ভখালি করে অনেক ছেলে চলে গেল।

এর মধ্যেই ভিয়েতনাম, চিলি, কালো আফ্রিকার কৃষ্ণসমুদ্র গর্জন আরব-ইজ্রায়েল, হাইজ্যাকিং বিমান, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সন্ধিপত্র, ক্রমবর্ধমান অস্ত্র-প্রতিযোগ, one world চিন্তা আবার শ্বেত-শ্যাম সংগ্রাম। এর মধ্যেই ভারতের মানুষ ছড়িয়ে ইউরোপ, রাশিয়া আফ্রিকা, ষ্টেটস্, ক্যানাডা। বিশ্বের মানুষ একদিন একরাত্রেই বোয়িং-এ

ভারতবর্ষে। অজন্তা, এলোরা, খাজুরাহো, কোনারক, জয়পুর, দিল্লীতে।

এর মধ্যেই বৃষ্টি এলে বন্যা, মৃত্তিকা শ্যামলী সব গৃহ পরিত্যাগ। বন্যাত্রাণ, মোতায়েন সৈনিকেরা, হেলিকপ্‌টারে খাদ্য।

বৃষ্টি না এলে খরা কৃষক উদ্বেগে ভরা
পুকুর নদী শুকুশুকু মাটি ছাই
মানুষ আকাশ দৃষ্টি, মেঘ জমে কিনা জমে
হিমবন্তে দেখা তাই আসে কিনা
সোঁদালি জলের গন্ধ পূবালি হাওয়ায়
বঙ্গোপসাগরে আর আরব সাগরে
লাগে কিনা ঢেউ পরে ঢেউ।

এর মধ্যেই অভিযান বিশ্ব নবনব রহস্যের উদ্‌ঘাটন। চাঁদের আলোর কাব্যি গেল কমে। মংগলের মাটি, আকাশ, বাতাস, জল অনুসন্ধানের অধ্যায়ন। এর মধ্যেই আর্তনাদ ক্যানসার ওয়ার্ডে Physical and mental.

এর মধ্যেই টি. ভি। ফাইভস্টার হোটেল, ঠাণ্ডা সুইমিং পুল, অবাধ সন্তরণ, অবাধ ক্লান্তি। জীবনের ঠাণ্ডা জমাট বাঁধা অনিশ্চয় অনুভব সব। অকারণ অস্থিরতা। প্রেম বিতৃষ্ণা, তৃষ্ণাদেহে তাও নয়, নেহাৎই অভ্যাস শুধু, অতএব নিত্যই নবনারীপুরুষ, নিতুই নব কৌতুক, কিছু পেয়, নর্তকীর নৃত্যকলা সংগে।

এরমধ্যেই এ্যাংরি, হাংরি, হিপি। গাঁজা, চরস, এল্‌এস্‌ডি, মারিজুয়ানা। ডিসকোথের নাচঃ আমাদের ছেলেদের আমাদের মেয়েদের। এরমধ্যেই এয়ার ফ্রাঁসে দ্রুতবেগে সার্ত্র, কামু, গদার, existentialism, মার্টিন হিয়েদগার, কিয়ের্কেগার্ড, কলিন উইলসন আশাবাদী কেউ, কেউ বা প্রবক্তা হতাশার। আবার কেউ গভীরতার গভীরে যেতে গিয়ে বাঁক নিয়ে হঠাৎ অকালটিষ্ট।

রবীন্দ্র-বিরোধী অভিযান শেষ এখন। প্রায় সকলেরি বিস্মরণ সেই দৃঢ়বদ্ধ মহীরূহ বৃক্ষ বনস্পতি। নটরাজমূর্তি ছাড়া আর সব

রূপই প্রায় ভুলতে বসেছে জনমানস। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর কোনো একটিও না পড়েও গান গাওয়া চলছে ঃ

"আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" অথবা "কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়"।

কোরাস গান চলেছে দলবদ্ধ ঃ "আমি ভয় করব না ভয় করবনা" অথচ প্রতিদশটিতে একটিও নেই যে পড়েছে, রাজাপ্রজা আত্মশক্তি অন্ততঃ মিসব্যাথবোন্‌কে লেখা অমোঘ চিঠিখানি।

এরমধ্যেই পার হচ্ছে দশক সংবাদ-বিসংবাদ। আশাবাদী উচ্চারণের ঢেউ পার হতে না হতেই পরবর্তীদশকের ধিক্কার তীব্র, আশা নেই, বাসা নেই, ইত্যাদি হতাশ্বাস উচ্চাবণ, অথচ বৃহৎ-অট্টালিকা ছেলেমেয়ের মোটা মাইনের তদ্‌বির। নিজেই নিজের খণ্ডন।

স্রোত এখন ভেসে চলছে চোখের পলকে পলকে। দশকের হিসেবও আর বাঁচেনা বুঝি। সেদিন তাকেই দেখলাম ঃ উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল, যে আমার কন্যাকে বলেছিল ঃ "মূঢ়, কেন বেঁচে আছ? এও জানা নেই, তুমি তো বিগত মৃত।" পাঁচবছরও যায়নি, এখনি তার কান্না, তার চেয়ে ছয়, সাত, আটের ছোটরা তুড়ি মেরে চলে গেছে অতীত কালের পরিহাসে।

আর সমস্তকে পিছে ফেলে পিষে দলে ধ্বংসে ধাবমান Brighter than a thousand suns, Quicker than light years ফুটন্ত future shock, মুহূর্তের হিসেবও মিলবে না। নিষ্কৃতিহীন জটিল-জাল্ ঃ সময়ের ঢেউয়ের সঙ্গে বুদ্ধির, commoditya সঙ্গে চিন্তার, প্রয়োজনের সঙ্গে হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতার ভয়ঙ্কর ব্যাপক রূপ?

অতঃ কিম্? নতজানু সময়ের কাছে? অথবা

বল্‌গা হুঁশিয়ার তেজীয়ান্ ঘোড়সওয়ার
কল্লোলিত পেশীর দুধর্ষ আন্দোলন
দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার সমুখের দু'পা স্থির ঊর্ধশূন্যে
দু'কষ বেয়ে বওয়া ফেনপুঞ্জ

ছুটন্ত মাংসপেশীরা অকস্মাৎ থেমে গিয়ে থর্‌থর্‌।

সময়কে তাল ঠুকে বলাঃ থামো।

যত ধাবমান হও, আমার চেয়ে তো বড়ো নও।

অথবা বলা স্নিগ্ধ কণ্ঠ জলকলতানঃ

সব নিয়ে তুমি যতই যাওনা ভেসে, ঢেউ পরে ঢেউ, এই আমি বসেছি তোমার নদীটির তীরে, ছলোচ্ছল জলধারায় শুনব তোমার কথা—ভেসে যেতে যেতেও যে কথা যাও বলে, ছুটে যেতে যেতেও, আজকের, কালকের, যে মুহূর্ত গেল চলে, যে মুহূর্ত আসছেঃ সমস্ত সময়ের শাশ্বতী। আমাকে ভাসাতে পারবেনা তোমার ঢেউ। যুগধর্ম আমি মানিনে, মানি মানবের ধর্ম।

কথাটির উচ্চারণ শোয়েইৎজারের। বলেছিলেনঃ যুগধর্ম আমি মানিনে, মানি মানবধর্ম। তারিজন্যে মানুষটি প্রস্তুত হয়েছিলেন দিনের পর দিন। নির্বাচন সেই দেশ, যে দেশ সবচেয়ে নিপীড়িত। তখনো আফ্রিকা ঘুমন্ত, তার সিংহ তখন থাবার বিবরে মুখ লুকিয়ে সুপ্ত, জাগেনি।

জার্মানীর আলোকপ্রাপ্ত দেশ থেকে এসেছিলেন, গ্যয়টের দেশ, রিলকে, কাফকা, টমাসমানের দেশ থেকে। সোপেন হাওয়ারের দেশ, বিটোফনের দেশ থেকে। সারাদিন হাসপাতালে কাজ সারতেন মানুষটি, গভীর নিবিড় রাত্রে বেজে উঠত তাঁর পিয়ানো আফ্রিকার ঘনবনের রাত্রে, কাউকেই শোনাবার জন্য নয়, নয় কোনো ambition, গম্ভীর সুন্দর প্রার্থনা। যদিও করেছেন মানুষেরই সেবা, তবু যা কিছু জীবন্ত, প্রাণবন্ত, তাতেই অগাধ প্রীতি। আফ্রিকার ঘনঅরণ্য, বড়ো বড়ো গাঢ় সবুজ পাতার গাছ। ঢেউ তোলা নদী হাঁ করা কুমীরে ভরা, সবই লেগেছে আশ্চর্য সুন্দর। যেহেতু বিশ্বাস তাঁর জীবন স্বীকৃতিতে। World and life afirmation.

*   *   *

গদার কিন্তু তাঁর নানা মেয়েটিকে বাঁচতে দেননি। বোধকরি জোলার রূপকস্বরূপিনী নানা প্রতীকস্বরূপ বিশশতকের। Genera-

tion gap-এর ফাঁক মেটাতে সে পারছে না। তার অগ্রবর্তী পূর্ব সূরীর মুখ থেকে শুনল : প্লেটো, কাণ্ট, হেগেল, মস্তেন এবং existentialism-এর উচ্চারণ তার নিজেরি। বাঁচার ইচ্ছা তার, অথচ বাঁচল না। কে দিলনা তাকে বাঁচতে? পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, যার হাতের পুতুল হয়ে গেল সে? অথবা তার জীবন, যেভাবে জীবন কাটিয়েছে সে? যুগ, সমাজ, রাষ্ট্র, সময় অথবা সময়ের স্রোতে ভাসা সংগ্রামহীন নিজেই? কী বলতে চাইলেন গদার? এই কথাই হয়তো বললেন : যে যুগ অগ্রবর্তী কোনো ইতিহাস খুঁড়ে দর্শন সমভিব্যবহারে তার রক্ষা নেই।

তবে জাগানো কেন এই ইতিহাস
সে তো পশ্চাতের, অগ্রবর্তীকালে
বক্তব্য আছে তার কিছু?
ভয়ঙ্কর যে কাল, ভয়ানাং ভয়ম্, ভীষণানাং ভীষণম্
স্মৃতিচারণের মূল্য কিবা?

এহ্‌রেন্‌বুর্গ যখন তাঁর স্মৃতিচরণে এমন কথায়ই আভাস দিয়েছেন সূত্রপাতে, সেই মুহূর্তের জন্য মনে হয়, হয়তো বা ক্লান্ত তিনি। People and Life বইতে বললেন : গত পঞ্চাশবছরে মানুষের ধারণায়, ঘটনায় পরিবর্তন এত দ্রুত যে অতীতকে যথোচিত চিন্তার দর্পণে দেখবার সময় খুব কম। ভেসে যেতে যেতে, ভেঙে যেতে যেতে আমরা যারা কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে বেঁচেছি, ভাবি, the age is too difficult to carry a load of memoriers. এমনকি যে ঘটনা দুটি একসময় সমস্ত জাতিগুলির পায়ের তলা ধ্বসিয়েছে সেই মহাযুদ্ধ দুটিও অতিক্রান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত।

তবু করেছেন স্মৃতিচারণ, ডিফিকাল্ট টাস্ককেই ক্যারি করেছেন যদিও ভিন্ন নাম। আত্মজীবনী নয় People and life, স্বজীবনকে রেখেছেন জনজীবনের পশ্চাতে।

যেহেতু স্মৃতিচারণের গ্রন্থ পৃষ্ঠাতেই অনন্য সাধারণ সব মানুষ, এবং সাধারণ আমাদের মতো মানুষের, আমরা জানি সময়, ঘটনা,

মানুষ, অধ্যয়ন করি মানুষের সংগ্রাম, জয়-পরাজয়, অতীত-বর্তমান, চিন্তা করি ভবিষ্যতের দিকে করব কোন পদক্ষেপ ?

যদি কিছু না থাকত উদ্ধার, বসতেন না রাসেল তার অটোবায়ো-গ্রাফী নিয়ে, বসতেন না গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ রোঁমা রোঁলা, টলষ্টয়, আইনষ্টাইন, আর বলতেন না এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌ :

আমি বললাম আমার পাঠকের সামনে বাধাবিঘ্ন, পর্বত-প্রমাণ ভুলসমূহ নিয়ে, আমার আশা-আকাঙ্খা, অকারণ সৌভাগ্য এব দুর্ভাগ্যের ভরা পাত্র নিয়ে। আশাবাদী ওয়েল্‌স্‌ তাঁর ভরাপাত্র নিয়েই বললেন :

"There is a hither to undreamt of fullness freedom and happiness within reach of our species. But if mankind fails to apprehand its opportunity then division, cruelties and ultimate frustration lies before our kind. The decision to perish and escape has to be made within a very limited time. (H. G. Wells)"

সময় এগিয়ে আসছে, উন্মত্ত, ধাবমান কাল। সময়ের রথচক্র-তলে পিষ্ট হবো আমরা, ভষ্মীভূত brighter than a thousand suns এ, উৎক্ষিপ্ত quicker than light yearsএ। সমস্ত স্থির করতে আমাদেরি, আর এখনি। অনেক ক্রন্দন হয়ে গেছে, অনেক বিমর্ষ চর্চা।

হে আমার প্রিয়, আমার ভাই, বন্ধু বোন, মাতা-পিতা, পুত্রকন্যা
যারা আমার সময়কালের আগের পরের যারা শোনো,
অমৃতের পুত্র, অমৃতের পুত্রীর মতই, মহৎ গম্ভীর উচ্চারণ প্রয়োজন।
যদিও অনেক অন্ধকারে, বিশ্বের ঘটনাসমূহ জাত হতাশা
নির্মম নির্দয়তা ইতিহাসের অনেক।
তবু অন্ধকার রাত্রি থেকে বার হয়ে এসো
দুর্গম পর্বতচূড়া করো অতিক্রম

সফেন সমুদ্র অপেক্ষা গর্জমান, চর্চাপেক্ষা ধ্বংস।
মুহূর্তে ভেঙে পড়বে বাড়ীঘর, জীবন-সমাধি,
অবশিষ্ট প্রেম, ভালোবাসা : সুন্দরের, কল্যাণের যেটুকু
রয়েছে বেঁচে।

মূল্যায়ণে আমি ছুঁতে চেয়েছি শিল্প : কিন্তু জীবনকে মেনেছি একান্ত। এবং সুন্দর জীবন সুন্দর শিল্পেরো ততোধিক। মূল্যায়ণে সাক্ষ্য মানি ক্লদইথারলির চেতনা : Burning conscience. গদার প্রশ্ন রেখেছেন ভিতরে দাঁ ভাতে, ক্লদইথারলিও প্রশ্নমুখর জীবন কীভাবে কাটাব, থীম মহত্তর। রাসেল উক্তি : শুধু prolonged injustice নয়, Symbolic of the Suicidal madness of our time.

ক্লীনকাট আমেরিকান যুবক ক্লদইথারলি, হাসিখুশি, মেজাজী মানুষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসেছিল স্বেচ্ছাসৈনিক। বিপর্যস্ত democracy বিপন্ন decency. তার ওপর ভার হিরোশিমা বোমা-বর্ষণ-পরিচালনা। ৬ আগষ্ট, ১৯৪৫, বর্ষণ অভিজ্ঞতা মূক করে দিল তাকে। কেউ তাকে কথা বলতে শোনেনি কয়েকদিন। কদিন পর মায়ের মৃত্যুসংবাদ এলো ক্যানসারে। ক্যানসার, মৃত্যু, প্রিয়তমা মা সমস্তই প্রতীকবহ। ওর মূকসত্তা কান্নায় ভেঙে পড়লো : এ আমার এ তোমার পাপ (রবীন্দ্রনাথ)

"We shall all be further punished" (B. C.)

ঘুম নেই চোখে, ঘুম নেই মনে ঘুম নেই ঘুম নেই
হিরোশিমার জ্বলন্ত আগুন, জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে
নাগাশাকির রক্তিম শিখারা
নরকাগ্নি, লেলিহান লেলিহান লেলিহান।

সমস্ত রাত ভাঙা, ফাটা উন্মাদ চীৎকার, দিনে স্বস্তি নেই, স্নায়ুমণ্ডলী থরোথরো, ব্যাঙ্কনোট এনভেলাপে পুরে পাঠাচ্ছে হিরোশিমা নাগা-শাকি। তার সঙ্গে কান্নাভেজা চিঠি—

"দয়া করে করো মার্জনা।"

অতি সাধারণ মানুষ ক্লদইথারলি; কোনো কাব্য বা নাট্যের হীরো হবার মতোই নয়। লোকচোখের বাইরে একটি সুখদুঃখময় জীবন কাটিয়ে যাবার কথা। নিউক্লেয়ার বিজ্ঞানীও নয় সে। Brighter than a thousand Suns এর লেখক রবার্ট য়ুংককে কোনো পাঠক লিখেছিলেন: "If Shakespere had Written Hamlet in our decade he would not made him a prince, but a nuclear Scientist." নিউক্লেয়ার বিজ্ঞানী না হয়েও শিকার সেই যুগের।

সাল ১৯৫০। প্রেসিডেন্ট ট্রুমেনের উচ্চকিত উচ্চারণ—"আনবিক অস্ত্রে আরো শক্তিশালী হবে আমেরিকা।" চমকে উঠল ক্লদ।

মেরুদণ্ডে বয়ে গেল হিমপ্রবাহ শৈত্য, দাঁতে দাঁত কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে, থর্থর্ কাঁপছে বুকের ভিতর। কী অভাবিত অবিশ্বাস্য ধূম্র-জাল। আমার ঘর, পৃথিবী, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের ছেলে-মেয়ে, ছোট্ট বাড়ী, সুন্দর বাগান সব ঘুরে যাচ্ছে শূন্যে। ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়ায়, আগুনের শিখায়। ভীত, বিপর্যস্ত আমি, আমি ক্লদ ইথারলি হিরোশিমার মার্জনা ভিক্ষাকারী আমি, আমার পায়ের তলায় মাটি দুলছে। শুধু আমার নয় অনেকের, অনেকদশক শতকের। হে মাটি, হে দেশ, হে পৃথিবী, হে আমার কাল, আমার কালের মানুষ: তোমরা বিপন্ন!

কিন্তু, সেদিন চীৎকার করতে পারল না ইথারলি। জ্বলন্ত অগ্নি-শিখারাও তপ্ত করতে পারছে না, ভয়ঙ্কর শীত। ঘুমিয়ে পড়তে চাই আমি ক্লদ। হিমপ্রবাহের জড়ে জড় আমার রক্ত, ঘুমোতে চাই অতল অগাধ ঘুমে।

তবুর প্রশ্ন তবু আছেই, ইথারলিকে জাগতে হয়েছিল। হোটেলের একঘরে ঘুমের ওষুধের শিশি উপুড় করেও চিকিৎসায় বেঁচে গেল। তারপর মেণ্টাল হস্পিটাল। হাস্পাতাল ফেরৎ বুঝল: দাম্পত্য

ভগ্ন। দুজনের মধ্যেকার সেতুটা নড়বড় করেও কোনক্রমে টিঁকে ছিল, আজ বিধ্বস্ত টুক্‌রো।

তবুর প্রশ্ন তবু আছেই, জেগে উঠ্‌তে হোল ইথারলিকে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯, জীবন কাটছে পালাক্রমে দুধারায়,—মেণ্টাল হস্‌পিটাল ন্যায়পক্ষ সমর্থনে উচ্চারণ; সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন, একেলা একাকীই উচ্চারণ। শেষপর্যন্ত এলো শুভসময়, বন্ধু দাঁড়ালো পাশে। স্ত্রী-সন্তান নয়, বাল্য, কৈশোর, যৌবনের কোনো বন্ধু নয়। ভিয়েনার দার্শনিক: Gunther Anders. চিঠি পত্রেই একজন একজনের বাড়ানো হাত, হাত বাড়িয়ে ধরল। যে হাত কম্পিত যে হাত অনিসন্ধিৎসু, যন্ত্রণায়, বেদনায়, পাপবিদ্ধতায় যে হাত চায় শুদ্ধতার প্রতীক কোনো বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ-আস্বাদন। পৃথিবীর ন্যায় আকাঙ্খী, সংগ্রামী সৎমানুষদের সমুখে একেবারে প্রথম সারিতে ক্লদকে নিয়ে এলেন Anders—unarmed Victory-র রাসেল, Children of Ashes এর রবার্টয়ুংক, তাদের হাতে নিবদ্ধ হোল তার হাত। রক্তাক্ত যন্ত্রনাবিদ্ধ, অনুতাপানলে দগ্ধ অথচ সংগ্রামী। কঠিন মূল্যদানে যে জেনেছিল: জীবন আদিমতম, কঠিনতম জীবন বিশ্বের আশ্চর্য ঐশ্বর্য। যে করেছিল গভীর উচ্চারণ শেষপর্যন্ত:

> Blessed are the peacemakers
> for they shall be called children of God.

অনেকেই হেসে উঠ্‌বে উচ্চকণ্ঠে: ধান ভানতে শিবের গীত! রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, আমি ও আমরা—কেন আসে ক্লদ, গদারের নানা—আইনষ্টাইন, সোয়েইৎজার, রাসেল ওয়েলস্‌, রবার্ট-য়ুংক।

কারণ, আইনষ্টাইনের মতো করে খুব কমজনই বোধ করতে পেরেছেন এই great eternal riddle কে, মানবজাতি নেই অথচ আছে বিশ্ব।

সেই মানুষটিও মানবতার ভবিষ্যতকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন। পৃথিবীর অপমৃত্যুর আগেই যেন নিজের হাতে মৃত্যু না ঘটাই। তাঁর অন্তরতম বিশ্বাস : দেশলাই আবিষ্কারে মানবসভ্যতা যখন ভস্মীভূত হয়নি, তখন নিউক্লিয়র চেন রিয়্যাকলনের আবিষ্কারেও হওয়া উচিত নয়। আমাদের সবশক্তি প্রয়োগ করতে হবে কেউ যেন এর দুরভিসন্ধিমূলক ব্যবহার না করে। এর ধ্বংসশক্তি সৃজনশক্তি দুই-ই জানতেন। তাঁর চিত্ত ছিল সৃজনের দিকে, তাই বললেন : প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রশস্তি গাইবেন।

আইনষ্টাইনও মেনেছেন "আপেক্ষিক" শাশ্বত বিধান। বিজ্ঞান নয় অপারাধী, বুদ্ধি নয়, হৃদয় নয়—অপরাধী দুর্বুদ্ধি। মেনেছেন মানুষের চরম বৈরী, মানুষের ambition, সাফল্য বড়ো নয় বড়ো মানুষের মহত্ব, মানুষকে ভালোবাসা। "মানুষের কাছে মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।"

এ্যামবিলানের তীব্রযুগে, প্রতিযোগিতামুখর, Successই যেখানে চরম, একথা শোনাবে হাস্যকর। তবু শোনো : অমৃতের পুত্রের মতই, অমৃতের পুত্রীর মতোই অবহিত, "মহৎজীবন ছাড়া কোনো রক্ষা নেই। অন্ততঃ সুন্দর এবং সৎ জীবনের চেষ্টা।"

মূল্যকে হাতের অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতে হলে শুধু সব-দশকে বা পঞ্চবর্ষে, একবর্ষে ভেসে গেলে চলে না। তাকে চলে যেতে হয় অন্য অন্য সব ঘরের অন্য কণ্ঠস্বরের কাছে। তাতে বর্তমান যেমন আছে, অতীতও বাদ-পড়ে না। ঘর, আঙিনা, পথ একত্রে।

রবীন্দ্র বিরোধীতার কাল শেষ এখন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিয়েছি অনেকখানি জোলো করে। তাঁর সম্বন্ধে কোনো ভাবনা না রেখেই তাঁর গান আমাদের গলায়। তাঁর মূল্যায়ণ নতুন করে হোক্ আবার। ভক্তের চোখ দিয়ে হবার দরকার নেই, ঋণী আমরা

এবং ইচ্ছা করলে আরো গ্রহণ করতে পারি ঐশ্বর্যময় ঋণ; এই বোধেই। আধুনিক কালে অনেক পাঠকপাঠিকার সংগে আমিও কৃতজ্ঞ বিষ্ণু দে, আবুসয়ীদ আইয়ুব। কৃষ্ণকৃপালনিজীর রবীন্দ্র-আলোচনায়। আর কৃতজ্ঞ হয়েছি শঙ্খ ঘোষের কাছেও, যিনি ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ নামে বিজয়ার স্মৃতিচারণ খানি স্প্যানিশ ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় ধরে দিলেন। যদিও জানি রবার্ট ফ্রস্টের মতই কবিতা অনূদিত হলে তার গন্ধ ফেলে হারিয়ে, তবু শঙ্খঘোষ যেহেতু কবি এবং বিজয়ার স্মৃতিচারণ কবিতা না হয়েও কবিতার কাছাকাছি তাই আশা করছি কিছু গন্ধ তার রয়েই গেছে, বিনষ্টি পায়নি। রবীন্দ্র অনুভব দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। পারা যায় নাকি এই দুই প্রান্তের গাঁটবন্ধনে একটি মালাগড়ে তুলতে? যে মালা গলায় পরে আমরা মূল্যবান হবো। একদিকে মনন আর একদিকে অনুরাগ চলে গেলে সংকট বেড়েই চলে। যে সংকটের মাঝখানে আমরা আজ দিশে-হারা।

আমাকে এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন: রবীন্দ্রনাথ শুধুই সুন্দর, শুধুই ঔপনিষদিক। সেই পুরানো তপোবনের দিনটিতেই তিনি আছেন সুন্দর, মংগলের ফ্রেমে আবদ্ধ, আমাদের দুর্ভোগ ভরা জীবনে তাঁর অবদান নিঃশেষের পথে।

ইচ্ছাকৃত আরোপ অথবা ভ্রান্ত ধারণা। রবীন্দ্রনাথও স্বজীবনের সংকট উত্তীর্ণ হবার জন্য মেলবন্ধন করেছেন অতীত-বর্তমান, স্বদেশ-বিদেশের, তার মূল্যায়ণে ঘাটতি থেকেই উদ্ভূত ধারণা। রবীন্দ্র চরিত্রকে আমি বারবার বলেছি: বৃত্ত Circle, বলেছি শতদল। একটি বা দুটি, তিনটি সমান্তরাল সরলরেখার পাশাপাশি যাত্রা নয়, যা কখনো হয় না সম্মিলিত। মাঝখানের কেন্দ্রবিন্দুটিতে রেখে আপন শক্তি টেনেছেন বৃত্ত। পদ্মের দলগুলি ছোট বড়ো, কোনটি ফুটেছে, কোনটি ফোটবার অপেক্ষায়, কোনটি বা ঝরোঝরো। গানের অঞ্জলি জীবনদেবতার পায়ে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ, কাব্যের মালা গলায় দুলিয়েছেন জীবন অধিশ্বরীর এই দুই রবীন্দ্রনাথ একহয়েও এক নন,

রয়ে গেছে টোনের তফাৎ। যে রবীন্দ্রনাথ গল্পলেখক কবির কাছাকাছি তিনি, উপন্যাস লেখক যিনি কখনো কবি, কখনো প্রাবন্ধিক, কখনো বা এসে গেছেন তাঁর ছবির কাছাকাছি—মননশীল আলাপ ও রচনায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথের সংগে নাচ, গান, অভিনয় শেখানোর নটরাজ, ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই—হাসিঠাট্টায় মুখর রবীন্দ্রনাথ, আর যে রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে হানা দিয়ে যেত মৃত্যুচিন্তা, নিশ্চিত একবিন্দুতে নন। মন্দির ভাষণের আচার্য রবীন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত যিনি সত্যমশিবম সুন্দরমকে পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন স্বজীবনে শান্তম্‌শিবম অদ্বৈতম রূপে তাঁর সেই হাহা হাসির ছবিগুলি কিম্ভুতকিমাকার কেউ কেউ—আর 'সকলেই ঘনতর গাঢ় রঙে রঙানো। পদ্মফুলের গোলাপী বা রক্তাভাই ছড়ানো ছিল, সত্যময়। ঘনতর সবুজের বৃন্তে কাঁটাও উচ্ছ্রিত। কাঁটাকে ধন্য করে ফুল ফুটোতে গিয়ে অনেক যন্ত্রনা। হতাশার অংশভাক হ'তে হয়েছে। নিশ্চিত রক্তাক্ত হয়েছেন এবং যেহেতু সূক্ষ্মতার শিখরে চড়েছিলেন, মরমীয়া গভীরে গভীরে এবং প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ রক্তাক্ত হয়েছেন আমাদের সকলের চেয়ে বেশী। তবু, ছিল নির্বাচন : আর এই নির্বাচনটিই কেন্দ্রবিন্দু : যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আসুব।

অস্বীকার করবনা, শুভবোধই কেন্দ্রে এবং সবচেয়ে শক্তিশালী। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাণের প্রবল passion (যাদর্থে) খুব কমজনই অর্জন করেছি আমরা। সেই passionকেও ছাপিয়ে উঠেছে শুভবোধ। নির্বাচন দ্বারাই এবং অর্জনে। বিজ্ঞানের যা কিছু শুভ নিতে চেয়েছেন আইনষ্টাইনের মতোই, যা কিছু অশুভ, ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছেন Vance Pacard এর Waste Maker দের থলিতে। Commodity চাই বৈ-কি? মানুষের দৈনিকতার বেড়াজাল মুক্তি, অবশ্য প্রয়োজন। তবু কিছু যেন না ছাড়িয়ে যায় মানুষকে।

বিশশতকের তিরিশ চল্লিশেই মানুষের সংগ্রাম ভুঁইফোড়ের মতো

গজিয়ে ওঠেনি মানুষের ইতিহাস বরাবর এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে সংকটের সরু সূত্রে ঝুলেই, চিরকাল মানুষের সংগ্রাম একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তবু বিশশতক জাগিয়েছে ভয়, সূত্র এসেছে অনেক সূক্ষ্ম হয়ে ওদিকে ভারের পুঞ্জ ক্রমেই পুঞ্জতর, ইতিহাসে আগে যা ঘটেনি। পৃথিবী নিকটবর্তী মুখোমুখি—অথচ অনেক দূর আমার আর আমার আপনজনের মধ্যে। জেনারেশান গ্যাপ ছাড়াও চিন্তাশীল এবং সাধারণ শিক্ষিত জনমানসের বিস্তৃত ব্যবধান।

শতবর্ষ উৎসব শেষ হবার অনেক পরে এই আটের দশকেও আমার সবচেয়ে বেদনাবহ লাগে বিচ্ছিন্নতা। যে রবীন্দ্রাথ মনন এবং নান্দনিক তত্ত্ব ও রস সম্মেলন ঘটিয়েছেন বরাবর তাঁকে স্মরণ করতে গিয়েও অর্বাচীনতা। রবীন্দ্র সংগীত ঘরে ঘরে গীত হোক্, সরু-মোটা, খাদ-চড়া, মিষ্টি-গভীর সব গলার অধিকারিরাই গাক্ তাঁর গান —কিন্তু তার মূল্য যেন পক্ষ মিউজিকের সমান না হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রভাষা, ভংগী, সংগীত, নৃত্যনাট্য যেন উপরিতলেই শেষ না হয়ে যায়।

পঁচিশে বৈশাখের নাচের গানের দলের সঙ্গে প্রভাতদা, শান্তিদা, রাণীদি, বৌঠান, আবুসয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, শঙ্খঘোষের বইগুলির পরিচয় ঘটুক। সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথের বইগুলি।

অস্বীকার করব না। রবীন্দ্র-শতদল গন্ধমুগ্ধ আমি ভক্তই। তবু আমার মুগ্ধতা পাপড়ি ছাড়িয়ে সংহত কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ। আমরা যাঁরা অন্ধকারের অতলান্তে অনেকদিন রাত্রির শয়নশেষে এলাম তাঁরা একথা ভুলব না : রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর প্রত্যয়ী এবং আমাদের অনেকেই নিহত ঈশ্বর-বোধে অথবা নিহত বা অনিহতের ঔদাসীন্যে অথবা নিহতকে পুনঃ জীবনদানের জন্য ব্যস্ত। এই কথাই ভুলব সমস্ত জীবন বুদ্ধি, চিন্তা, সৃজন, শিল্প, সংগ্রামে রেখে গেছেন মানুষের শুভ ভবিষ্যত কামনা। এবং বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী হিসেবে সেখানে জড়ো হতে এবং সমস্ত বিরোধের মধ্য থেকেও মিলন সূত্রে গেঁথে

নেবার ঋণে ঋণী হ'তে বাধা নেই। হয়তো বা উচ্চারণ করতেও পারব তারি ফলে :

হিংসামত্ত হয় যদি পৃথিবী, ক্রোধ-অন্ধ, মূর্খ উল্লাস
সব পথ যদি করে দিতে চায় বন্ধ স্বার্থের পিচ্ছিল রাত
আমাদের আজকের দিনের সমস্ত বাঁচা হোক্
কালকের শুভদিনটির জন্য।
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।